রাষ্ট্র-সংগ্রামের এক অধ্যায়

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

পঞ্চাশের মন্বন্তর

নূতন চতুর্থ সংস্করণে 'উডহেড কমিশনের রিপোর্ট' ও 'রিপোর্টে অসঙ্গতি' নামক দুটো নূতন অধ্যায়ে দুর্ভিক্ষ-কমিশন রিপোর্টের তথ্যবহুল আলোচনা আছে। এই নব সংযোজনে বইখানা পূর্ণাঙ্গ ও অধিকতর মূল্যবান বলে পরিগৃহীত হয়েছে। দাম দুই টাকা।



রাষ্ট্র-সংগ্রামের এক অধ্যায়

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা



প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৫৩

প্রকাশক—
মনোজ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—
শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট ছেপেছেন—
ভারত ফোটো-টাইপ ষ্টুডিও

বাঁধিয়েছেন—
বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দাম দুই টাকা

পটভূমিকা

ডিসেম্বর, ১৯৪১। রেঙ্গুনে বোমা পড়েছে, জাপান বিদ্যুদ্‌গতিতে এগোচ্ছে। দেশের মধ্যে বিরোধের অন্ত নেই। হিন্দু-মুসলমানে হানাহানি; সাম্প্রদায়িকতা আকাশ-বাতাস বিষাক্ত করে তুলেছে।

দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনা করে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, আবুল কাসেম ফজলুল হক ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হাত মিলালেন। প্রগতিবাদী অসাম্প্রদায়িক মন্ত্রিসভা গড়বার আয়োজন হচ্ছে, শরৎচন্দ্র এই সময়ে আটক হলেন। তবু ঐক্য-প্রচেষ্টায় ভাঙন ধরল না; নূতন মন্ত্রীদের চেষ্টায় দাঙ্গাহাঙ্গামা যেন যাদুমন্ত্রে অন্তর্হিত হয়ে গেল। বিপদের মুখে আমাদের এমন সংহতি দেখাবার শক্তি আছে—দেশবাসী নূতন আশায় সঞ্জীবিত হল।

কিন্তু ক্লাইব স্ট্রীটের বণিক আর স্থায়ী সরকারি কর্মচারীদের কাছে এ মিলন বাঞ্ছিত নয়। অন্তর্দাহ হল আরও অনেকের, জাতি ঐক্যবদ্ধ হলে যাদের নেতৃত্ব ও মুনাফার সুযোগ থাকে না। গবর্নর স্যর জন হার্বার্টও নূতন মন্ত্রিমণ্ডল পছন্দ করতে পারলেন না।

মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ জাতীয় গবর্নমেণ্ট ও দেশরক্ষী সৈন্যদল গড়বার প্রস্তাব করলেন। দ্বারে শত্রু—দেশের মানুষ প্রাণ দিয়ে তাদের প্রতিরোধ করতে চায়। ইংরেজের করুণায় প্রায় দু'শ বছর ধরে নাবালকত্বের মহিমা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। যারা মানুষের মতো বেঁচে থাকতে দেয় নি, শ্যামাপ্রসাদ তাদের কাছে মানুষের মতো মরবার অধিকার চাইলেন।

সঙ্কট-সময়ে যে দূরদৃষ্টি, সাহস ও হৃদয়বত্তার প্রয়োজন, স্যর জন

হার্বার্ট ও তাঁর আমলাচক্রের তা ছিল না। মন্ত্রীরা একরকম একঘরে হলেন, শাসনকার্য জনকয়েক স্থায়ী শ্বেত-কর্মচারীর মতলব মতো চলতে লাগল।

বঞ্চনানীতি শুরু হল। জাপানিদের আতঙ্কে তাড়াহুড়া করে গবর্নর নিজের দায়িত্বে নৌকো গাড়ি সাইকেল ইত্যাদি সরিয়ে ফেললেন। কয়েকটি জেলা থেকে চাল সরাবারও হুকুম হল। জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত। সরকারের পেয়ারের ব্যাপারিরা খুশি মতো চাল কিনবার ভার পেয়ে দু-হাতে রোজগার করতে লাগল। চোরাবাজার ফেঁপে উঠল দেখতে দেখতে।

সর্বনাশের সূত্রপাত হচ্ছে, শ্যামাপ্রসাদ বুঝতে পারলেন। বঞ্চনা-নীতির মূলে যে পরাজয়-মনোবৃত্তি, তাঁর কাছে তা অসহ্য মনে হল। কর্তৃপক্ষকে তিনি সাবধান করে দিলেন বঞ্চনা-নীতি পুণর্বিবেচনা করবার জন্য। কিন্তু আমলাচক্র ঐ নীতির দূরপ্রসারী ভয়াবহতা ভেবে দেখল না, অতি-অবহেলায় মানুষের চিরাচরিত স্বচ্ছন্দ জীবন-ব্যবস্থা ওলট-পালট করে দিল।

আগস্ট, ১৯৪২। কংগ্রেসের বোম্বাই-প্রস্তাবে প্রভুদের ধমনীতে উত্তেজনার স্রোত বইল। এ সম্পর্কে বাংলা-গবর্নমেণ্টের নীতি নির্ধারিত হয়ে আসছে নয়াদিল্লি থেকে চীফ-সেক্রেটারির নামে। গবর্নমেণ্ট-হাউসে সামরিক কর্তাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ চলে, সরকারি স্থায়ী কর্মচারীদের কেউ কেউ থাকে, মন্ত্রীদের কেবল ডাক পড়ে না। অবস্থাটা বড় মজার। কাজটা করছেন স্যর জন হার্বার্ট ও তাঁর আমলাচক্র, আর দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি করতে হচ্ছে মন্ত্রীদের। আসল-প্রভুদের কোন দায়িত্ব নেই, ক্ষমতা আছে নিরঙ্কুশ। কর্তারা ও প্রতিপক্ষ যেন পাল্লা দিয়ে অরাজকতা সৃষ্টি করছেন। মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। এর মূলে রয়েছে জনগণের স্বাধীনতার ক্ষুধা; তাদের শান্ত করবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার হওয়া উচিত।

শ্যামাপ্রসাদ দিল্লি গেলেন ; সকল দলের নেতাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করলেন। অচল অবস্থা দূর করতেই হবে। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি মিলল না, চেষ্টা পণ্ড হল।

প্রত্যাসন্ন দুর্ভিক্ষের ছায়া ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। সেদিকে কারও দৃষ্টি নেই। খাদ্য-সরবরাহ ও সরবরাহ-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষের অসঙ্গত হস্তক্ষেপ চলছে। মেদিনীপুর অঞ্চল বাত্যায় বিধ্বস্ত হল। এর পরও এমন সব অত্যাচার চলল, সুসভ্য মানুষের সমাজে যা ঘটতে পারে বলে কারও বিশ্বাস ছিল না।

আর মন্ত্রিত্ব করা চলল না। আমলা-তন্ত্রের গোলকধাঁধা থেকে শ্যামাপ্রসাদ বিমুক্ত দেশের মাটিতে দুঃস্থ দেশবাসীর হাত ধরে দাঁড়ালেন।

এই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় গবর্নর ও ভাইসরয়কে লেখা কয়েকখানা যুক্তিগর্ভ তীক্ষ্ণ পত্র এবং কয়েকটি বিবৃতি ও আলোচনা দিয়ে 'A Phase of the Indian Struggle' বই প্রকাশিত হয়। বইখানা সরকার অনতিবিলম্বে বাজেয়াপ্ত করলেন। সম্প্রতি রাহুমুক্ত হয়েছে। 'রাষ্ট্রসংগ্রামের এক অধ্যায়' ঐ ইংরাজি বইয়ের মর্মানুবাদ। দেশের সেই পরম সঙ্কট-কালের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখবার সময় এই বই থেকে অনেক অমূল্য উপাদান পাওয়া যাবে। একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে স্বৈরাচার শাসনতন্ত্রের সুতীব্র সত্য সমালোচনা করেছেন, তার যথার্থ স্বরূপ মর্মান্তিক রূপে উদ্‌ঘাটিত করেছেন—এই হিসাবে বই-খানার মূল্য অপরিমেয়।

১লা ভাদ্র,
কলিকাতা

প্রকাশক

চিঠি

(১)

৭ মার্চ, ১৯৪২

প্রিয় স্যার জন হার্বার্ট,

আজ বিকালে আপনি দিল্লী রওনা হবেন জেনে এই সঙ্কট-মুহূর্তে আমি আমাদের ভবিষ্যৎ-ঘটিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্বন্ধে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। এই আশায় করছি যে আপনি মাননীয় বড়লাট ও প্রধান-সেনাপতির সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

পরাজয়ী-মনোবৃত্তির নৈরাশ্য-অন্ধকারে আমরা ডুবে না যাই—এ বিষয়ে আমার উদ্বেগ কারও চেয়ে কম নয়। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে আপনি কিংবা আমরা বর্তমান গুরুতর পরিস্থিতির বাস্তবতাকে অবজ্ঞা করতে পারি। ভারতে সামরিক আত্মরক্ষা-কার্যের সঙ্গে প্রায় দু-শ বছর ধরে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই। বৃটিশ গবর্নমেণ্ট এবং তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিরা বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে ভারত-রক্ষার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এজন্য ভারতের অর্থ যথেচ্ছ ব্যয় করা হয়ে থাকে। আমাদের নিরস্ত্র এবং সামরিক বিদ্যায় অশিক্ষিত করে রাখা হয়েছে। ভারতের সামরিক

নীতি সম্বন্ধে কোন ভারতীয় প্রতিনিধিরই কিছু করবার নেই। ১৯৩৯ অব্দে যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে আমরা শুনে আসছি, মধ্য-প্রাচ্য কিংবা সুদূর-প্রাচ্য—বিশেষ করে সিঙ্গাপুরের মতো বহির্ব্যূহগুলি রক্ষা করে ভারতের যুদ্ধ ভারতকেই চালাতে হবে। ভারত-রক্ষার জন্য ভারতে গৃহরক্ষা-বাহিনী সংগঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। আজ বিপদ এসে পড়েছে, বহির্ব্যূহগুলি ভেঙে পড়েছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অকপট সরলতার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, শত্রুর দয়ার উপর আমরা একান্তভাবে নির্ভরশীল; আমরা যদি ১৯৪২-এর বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারি, তবেই ১৯৪৩ অব্দে আমাদের রক্ষার জন্য কোন-কিছু হয়তো করা যেতে পারবে।

সুদূর-প্রাচ্যের সর্বত্রই শত্রু আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—এটা প্রমাণিত হওয়ায় বৃটিশ-মর্যাদায় সাংঘাতিক রকম আঘাত লেগেছে। কোথাও বাধা দিয়ে যদি শত্রু-সেনাকে পরাজিত করা যেত, তাহলে বৃটিশ-মর্যাদা বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু করা হয়েছে—এমন কথা বলা চলত। অন্যত্র যে পোড়া-মাটির নীতি প্রযুক্ত হচ্ছে, ভারতের ক্ষেত্রে তা প্রযুক্ত হলে সাংঘাতিক কুফল দেখা দেবে। ঐ নীতির অর্থ, সামরিক প্রতিরোধ ব্যর্থ হলে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় ধ্বংস করতে হবে, যাতে শত্রু কোন প্রকারের সুবিধা পেতে না পারে। রাশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু সেখানে জনগণ

জাতীয় নেতৃত্বে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে তারপর নিজেরাই স্বেচ্ছায় এ কাজ করেছে।

বড়লাটকে আপনার একথা বুঝিয়ে বলা উচিত, বিলম্বে হলেও এখনও ইংল্যাণ্ড এবং ভারতের মধ্যে একটা মীমাংসা হওয়া উচিত যাতে ভারতীয়রা স্বতস্ফূর্ত ভাবে এ যুদ্ধকে প্রকৃত জন-যুদ্ধ বলে অনুভব করতে পারে। যুদ্ধ-জয় করতে হলে ভারতের স্বার্থরক্ষার খাতিরে অবিলম্বে ভারতের আত্মরক্ষা-নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা-সমন্বিত শক্তিশালী জাতীয় গবর্নমেণ্ট গঠন করতে হবে।

চীনের স্বদেশীয় জেনারেলিসিমোই শত্রু-প্রতিরোধের জন্য চীনের জনগণকে সর্বস্বত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পেরেছেন। স্ট্যালিন এবং রাশিয়ার মনোনীত তাঁর সহ-কর্মীরাই রাশিয়াকে অভূতপূর্ব বীরত্বে উদ্দীপ্ত করেছেন। আপনাদের নিজেদের লোক চার্চিলই এই বিপদের মুহূর্তে কম্বুকণ্ঠে আপনাদের কাছে কাজের আহ্বান জানাচ্ছেন। আপনাদের শাসনতন্ত্র-অনুযায়ী জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফত মহাবিপদের মধ্যেও রাষ্ট্রিক পরিবর্তন দাবী করতে পারে; দেশ চায় না এমন প্রধানমন্ত্রী ও অপর মন্ত্রীদের জনসাধারণের দাবি অনুসারে স্বচ্ছন্দে সরিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু এখানে প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে দায়িত্বহীন আমলাতন্ত্রের হাতে যাদের আমরা সরাতে পারি না—আমাদের জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে

তাদের সরানো অবশ্যকর্তব্য হলেও কোনক্রমে তা সম্ভব হয় না।

আমি অনেকবার আপনার কাছে প্রস্তাব করেছি, বাংলাদেশ রক্ষার জন্যে একটা গৃহরক্ষী-বাহিনী সংগঠনের ক্ষমতা আমাদের দেওয়া উচিত। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের যে কোন স্থানে পাঠানো চলবে—এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ না হয়েও জনগণ যেন এই বাহিনীতে যোগ দিতে পারে। কিন্তু ঐ সত বাদ দেওয়া চলবে—এ প্রস্তাবে আপনি সম্মতি দেন নি। সর্তের অনুকূলে অতীতে যে যুক্তিই থাকুক, আজ যখন ভয়ঙ্কর বিপদ আমাদের দ্বারপ্রান্তে এসে পড়েছে এবং আপনাদের সমর-সামর্থ্যও যখন নৈরাশ্যজনক ভাবে সীমাবদ্ধ, তখন মাতৃভূমি-রক্ষার জন্যে আমরা গৃহরক্ষী-বাহিনী সংগঠনের অনুমতি কেন পাব না? অস্ট্রেলিয়া এই ব্যবস্থা করেছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে যেসব তেজোদ্দীপক কথা বলেছেন তার সঙ্গে ভারতের অনুসৃত নীতির ব্যবধান অনেক। এই বিলম্বিত ক্ষণেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যদি সামান্য সদিচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে জনগণের মন আকৃষ্ট করা যাবে—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতীয়ই আজ দেশ রক্ষা করতে চাচ্ছে। কিন্তু আমরা নিজেদের বাহিনী গঠন করতে পারি না, কিংবা প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদও পেতে পারি না।

বর্তমান সঙ্কট-মুহূর্তেও গৃহরক্ষী-বাহিনী গঠনের বিরুদ্ধে আপনার আপত্তি এই যে, এরূপ বাহিনী ভারতীয়

সামরিক নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আমার উত্তর এই, প্রথমত এবং প্রধানত ভারতের স্বার্থেই আজ সামরিক নীতি নির্ধারণ করতে হবে। বাংলা কিংবা ভারত-রক্ষার জন্য যদি বাংলার গৃহরক্ষী-বাহিনীকে বাংলার বাইরে পাঠানো প্রয়োজন হয়, তবে তা অবশ্যই করা হবে। কিন্তু তা করা হবে স্পষ্ট সুসমন্বিত নীতিতে; বাংলা কিংবা ভারতের বিপন্ন অঞ্চল বাদ দিয়েও ভারতের বাহিনী বহির্ব্যূহ রক্ষা করতে যাবে—এই নীতি অন্যায়ভাবে টেনে বাড়ানো চলবে না। আমরা চাই, বাংলা-রক্ষার কাজে যতদূর সম্ভব বাঙালি সৈন্যই নিযুক্ত থাকবে—প্রয়োজন হলে ভারতের অপরাপর প্রদেশেরও সৈন্য থাকবে, আর নিতান্ত শেষ আশ্রয় হিসাবেই অভারতীয় সৈন্য নিয়োগ হতে পারবে।

আপনার পরবর্তী আপত্তি, যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কার দোষে আজ ভারতের ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সমরসজ্জা পাওয়া যায় না? আমি প্রস্তাব করছি যে, সাধ্যানুযায়ী সমর-উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করব, এবং আজ যে সামান্য পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায় তাই দিয়েই গৃহরক্ষী-বাহিনীকে শিক্ষা দেব। এ বিষয়ে মাদাম চিয়াংকাইশেক এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর আবেগময় আবেদন স্মরণ করবেন। চীনের সমর-সরবরাহ ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; ঐ মহিয়সী মহিলা প্রশংসনীয় গর্বের

সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে চীনের জনগণ যখন জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করেছিল তখন তাদের দেহের রক্ত-মাংস এবং শূন্য হাত ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তাঁদেরও অস্ত্রাদির বিশেষ অভাব ছিল; তাঁরা যখন গৃহরক্ষী-বাহিনী পুনর্গঠন শুরু করেছেন, তখন সামরিক শিক্ষাদানের একটি পর্যায়ে তাঁদের ঝাঁটা পর্যন্ত ব্যবহার করতে হয়েছিল। আপনি যে আপত্তি তুলেছেন, এই সঙ্কট-মুহূর্তে তার কিছুমাত্র মূল্য নেই। অসুবিধা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু নূতন নীতি অনুসারে যদি আমরা এগিয়ে যেতে পারি, তবে ভারতের অসহায়তার জন্য কে দায়ী, সে প্রশ্ন আমি আর তুলব না। এই সঙ্কটে যদি আমাদের বাঁচতে হয়, তবে সাহসের সঙ্গে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে এবং সকল অসুবিধা অতিক্রম করে যেতে হবে। প্রকৃত বাধা হচ্ছে, বিশ্বাসের অভাব। আজও কি আপনারা আমাদের বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নন? আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বাহিনী-সংগঠনের প্রাথমিক অধিকার থেকে আপনারা যদি আমাদের বঞ্চিত করেন, তবে ইতিহাসে আপনারা নিন্দিত হবেন। হয়, বলুন যে আপনারা আমাদের রক্ষা করবেন, প্রয়োজনের সময় দেশরক্ষার যথেষ্ট সামরিক ব্যবস্থা থাকবে—ভারত আত্ম-রক্ষার অধিকার চায় বলে এ উত্তর তার জাতীয় মর্যাদায় অবশ্যই আঘাত দেবে; তবু এ ধরনের উত্তরের যথেষ্ট কার্যকর গুরুত্ব আছে। আর, ভারতকে রক্ষা করা হবে, আপনারা যদি

এ ভরসা দিতে না পারেন—তবে এই বিলম্বিত মুহূর্তেও এ দেশের লোকে যে উপায়ে ভাল মনে করে, সে উপায়ে তাদের আত্মরক্ষার অধিকার দিতে আপনাদের এত দ্বিধা কেন? আজ ভারতের স্বার্থই বড় বলে বিবেচিত হোক; যে ভীষণ বিপদে আপনারা আমাদের এনে ফেলেছেন, সে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার উপায় ভারতীয়দেরই নির্ধারণ করতে দেওয়া হোক।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, শেষ মুহূর্তে এই ধরনের বাহিনী বাংলাকে কি ভাবে বিমান-আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবে? আমরা যদি নিজেদের বিমান–বাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলতে পারি, তবেই সংগ্রাম চালানো সম্ভব হবে। জাপান নিকট-ভবিষ্যতে বাংলায় অবতরণ করতে পারে; এ যদি সত্যিই ঘটে তবে আমাদের গেরিলা যুদ্ধের ভয়ঙ্কর বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হবে—এটা কি খুবই সম্ভব নয়? এই বিপদকে প্রতিরোধ করার জন্য আমরা কি প্রস্তুত? জাপানীরা এই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এরূপ অভিযানের বিরোধিতা করার মতো শক্তি কি আমাদের আছে? এ ছাড়া আভ্যন্তরীণ নিরপত্তা-রক্ষার প্রশ্নও আছে। প্রথম থেকেই সম্পূর্ণভাবে সমর-সজ্জায় সজ্জিত যদি না-ও হয়, তবু প্রধানত দেশীয় জনগণের দ্বারা গঠিত নিয়মানুবর্তী সৈন্য-দলের সাহায্যেই শুধু আমরা সাধারণ জনগণের মনে সাহস এবং নির্ভীকতার প্রকৃত প্রেরণা জাগানোর আশা করতে পারি। আমার ইচ্ছা, একটি সরকারি বিভাগের একীভূত

নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রত্যেক জেলা, প্রত্যেক মহকুমা এবং প্রত্যেকটি থানায় নিজ নিজ গৃহরক্ষী-বাহিনী থাকবে। এটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বিভাগ হিসাবে কাজ করবে না—বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এর পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে। শত্রুর আসন্ন আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার হাত থেকে গৃহ ও সর্বস্ব রক্ষার জন্য এটি হবে জনগণের বাহিনী।

আমি বেসামরিক আত্মরক্ষামূলক কাজের মূল্য কমাচ্ছি না। সে কাজ অত্যাবশ্যক। কিন্তু শুধু যদি এই সব কাজের উপরই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হয়, তবে আপনা থেকেই পরাজয়ী-মনোবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া হবে। যতই হোক, এ শুধু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। সে সব স্থান আক্রান্ত হয়, সেগুলো রক্ষার জন্য মৃতদেহ এবং ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু বেসামরিক আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা এবং সামরিক আত্মরক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে পরিপূর্ণ সমন্বয়-সাধন করতে হবে এবং উভয় ক্ষেত্রেই এ কাজ হবে জনগণের নিজেদের প্রতিনিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জনগণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টার প্রতীক। মন্ত্রী রূপে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের দেশের সামরিক নীতি সম্বন্ধে কিছুই জানি না। বেসামরিক নীতির মধ্যেও অবিলম্বে সমন্বয়-সাধন প্রয়োজন; জনগণের প্রতিনিধিদের পূর্ণ সহযোগিতার দ্বারাই তা করতে হবে।

আমি আগেই বলেছি, দৈনন্দিন কার্যক্রমের দিক থেকে এ সম্পর্কে অনেক আপত্তি উঠবে। কিন্তু আপনার কাছে এবং

আপনার মধ্যস্থতায় বড়লাটের কাছে আমার আবেদন এই যে, আজকার দিনে শাসনকার্য সম্বন্ধে আপনাদের নিয়মতান্ত্রিকতা এবং আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ত্যাগ করার মতো সাহসী হতে হবে। আমি আপনাকে বহুবার বলেছি, ভারতীয়েরা আদৌ চায় না ভারতে বৃটিশ-শাসন স্থায়ী হোক ; কিন্তু ভারতের এমন কোন বুদ্ধিমান মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীও নেই যিনি চান যে ভারত জাপানের অধীনে নূতন করে বিদেশী শাসনের জীবন শুরু করুক। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ প্রায় শেষ অধ্যায়ে এসে পৌঁচেছে। এখন সর্বাধিক প্রয়োজন, ভবিষ্যতে ভারত ভারতীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এই নীতির পূর্ণ স্বীকৃতির উপর স্থাপিত উদার রাজনীতি। উভয়পক্ষে কৌশল এবং সাহস থাকলে আমরা ভবিষ্যতে সব সময়ের জন্য বন্ধু হয়েই থাকব। কিন্তু আপনাদের চেষ্টা করে আমাদের বিশ্বাস ফিরে পেতে হবে। অতীতের ভ্রান্ত পদক্ষেপ সংশোধন করতে আর একটি দিনও নষ্ট করা উচিত নয়। বাংলা এবং ভারত বিদেশি অভিযানের হাত থেকে রক্ষা পাক—এই ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে আমি আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই যে আপনি যেন দিল্লী থেকে এমন সুস্পষ্ট বাণী নিয়ে ফিরতে পারেন যার ফলে এই প্রদেশের জনগণের মনে স্বতস্ফূর্ত উৎসাহ আনয়ন করবে। প্রত্যাবর্তনের পর আইন-সভায় বক্তৃতা দিয়ে আপনার এই কথা ঘোষণা করা উচিত হবে যে, সামরিক আইনের বিধিগুলো অতঃপর সাময়িক ভাবে নিষ্ক্রিয়

থাকবে এবং বাংলা-রক্ষার জন্য অন্তত দুই লক্ষ লোকের বিশেষ একটি গৃহরক্ষী-বাহিনী সংগঠনের অধিকার বাংলাকে দেওয়া হবে ; বিমান-বাহিনী শক্তিশালী করার এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদের উৎপাদন বৃদ্ধি করার অন্যান্য পরিকল্পনাও অবিলম্বে হাতে নেওয়া হবে ; দেশ-রক্ষার জন্য বেসামরিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে বাংলায় একটি প্রাদেশিক জাতীয় কমিটী স্থাপিত হবে ; পুরাতন রাজনৈতিক বিভেদ দূরীভূত করা হবে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যারা আগ্রহশীল তাদের সকলেরই সহযোগিতা চাওয়া হবে। এই জাতীয় ঘোষণা করলে সমগ্র প্রদেশ সাগ্রহ অভিনন্দন জানাবে। শত্রু যতই শক্তিশালী হোক না কেন, নির্ভীক ভাবে তার সম্মুখীন হবার মতো নূতন মনোবৃত্তি আমরা সৃষ্টি করতে পারব—এ বিষয়ে আমার সামান্য মাত্র সন্দেহ নেই। এর সঙ্গে সঙ্গে যদি বৃহত্তর রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়, তবে যুদ্ধের সময় বৃটেন শুধু ভারতেই নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করবে না, সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে স্থায়িত্ব দান করবে।

আমি জানি না, প্রধান-সেনাপতির কলিকাতায় আসার সম্ভাবনা আছে কিনা। আমি আশা করি, আপনি আমার এই চিঠি তাঁকে ও বড়লাটকে দেখাবেন।

আপনার বিশ্বস্ত

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মাননীয় স্যার জন হার্বার্ট

বাংলার গভর্নর

(২)

২৬ জুলাই, ১৯৪২

প্রিয় স্যার জন,

মন্ত্রিমণ্ডলের গত অধিবেশনে যে সব সমস্যা নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছিলাম—বিশেষ করে কংগ্রেসের প্রস্তাবিত আন্দোলনের সমস্যা—সেগুলো সম্বন্ধে আমি বিশেষ-ভাবে ভাবছি। এই সঙ্কটের সময় গবর্নর হিসাবে আপনার এবং আপনার সহকর্মীদের মধ্যে পুরোপুরি বোঝাপড়া থাকা অত্যাবশ্যক। আমি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে এ চিঠি পাঠাচ্ছি ; তা হলেও আমার অন্যান্য সহকর্মীদের কাছে এ চিঠির নকল পাঠানোর ইচ্ছা আমার আছে। প্রধানমন্ত্রী দিল্লী থেকে ফেরার পর তাঁকে আমি এ চিঠি দেখাব।

আপনার মনে আছে, বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল ব্যবস্থা-পরিষদের এমন কয়েকটি দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত, যাঁরা বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যাকে একই দৃষ্টি দিয়ে দেখেন না। তবু এই দলগুলি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সম্মিলিত হয়েছে। এই সাধারণ বোঝাপড়ার ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রীকে তারা মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে সাহায্য করেছে যে নব মন্ত্রিমণ্ডল সকল সম্প্রদায়ের শাসন-সম্পর্কিত ন্যায়নীতির ভিত্তিতে গঠিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য চেষ্টা

করবে, এবং যুদ্ধজয়ের জন্য তাদের পরিপূর্ণ সমর্থন দেবে। আমরা সবাই অনুভব করেছিলাম, .বর্তমান জরুরি অবস্থায় ভারতের মুক্তি নিহিত আছে আমাদের পারস্পরিক ব্যবধান বৃদ্ধির মধ্যে নয়—বরং যতটা সম্ভব সে ব্যবধান কমানোর মধ্যে। এই সব প্রশ্নের গুরুত্ব সকল সম্প্রদায়ের পক্ষেই সমান, এইরূপ বিবেচনা করে—বিশেষ করে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং কার্যকরী উপায়ে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে—আমরা এগুলোর উপরই জোর দিয়েছি। এই নীতি কাজে পরিণত করার জন্য, বর্তমান শাসনতন্ত্রের সীমার মধ্যে থেকেও প্রদেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করার মতো ব্যাপক ক্ষমতা দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের থাকা উচিত ; গবর্নর কিংবা সংশ্লিষ্ট স্থায়ী-রাজকর্মচারীদের হস্তক্ষেপ করে কিংবা বাধাদান-মূলক কাজ করে তাঁদের চেষ্টা ব্যাহত করা উচিত নয়। আমাদের দিক থেকে আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি যে, ভিতর ও বাইরে থেকে গুরুতর প্ররোচনা আসা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান প্রতিনিধিরা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে একযোগে কাজ করতে পারেন।

বাংলায় মৌলবি ফজলুল হকের নেতৃত্বে হিন্দু এবং মুসলমানের মিলন একদল স্থায়ী-রাজকর্মচারী ভালভাবে গ্রহণ করেন নি। এই মিলিত দলে হিন্দুদের এমন অনেক প্রতিনিধি আছেন যাঁরা অতীতে শাসনকার্যের বিরোধিতা করেছেন। রাজ-কর্মচারীদের বিরুদ্ধ মনোভাব কতটা যে সেই বিরোধিতার

দরুন দায়ী, তা নিশ্চয় করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মৌলবি ফজলুল হকের নূতন মন্ত্রিমণ্ডল-গঠনের ফলে মুসলিম লীগ সুনিশ্চিতরূপে দুর্বল হয়ে পড়েছে ; লীগের প্রতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের যে অযৌক্তিক প্রীতি আছে—তার দরুনও এ মনোভাবের সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, শাসনকার্যের ক্ষেত্রে হিন্দু এবং মুসলমান নেতারা একযোগে কাজ করতে পারেন না বলেই ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অগ্রগতি পিছিয়ে যাচ্ছে। আমাদের হাতে যে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র দেওয়া হয়েছে, তার বহুবিধ ত্রুটি থাকলেও বৃটিশ-ভারতের ইতিহাসে বাংলাতেই প্রথম নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উপর প্রভাবশালী হিন্দু এবং মুসলমান প্রতিনিধিরা একযোগে তাকে কার্যে পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এই পরীক্ষা সফল হলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে—এ অজুহাত স্বভাবতই মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে। কাজেই এই পরীক্ষা যাতে ব্যর্থ হয়, তার ব্যবস্থা করা গোঁড়া রাজকর্মচারীদের স্বার্থের পরিপোষক।

স্পষ্ট করে বলতে গেলে, মন্ত্রিদল সম্পর্কে আপনার নিজের মনোভাব প্রথম থেকেই সন্তোষজনক নয়। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে বিগত মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করার পর নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্পর্কে মৌলবি ফজলুল হককে আহ্বান করার বিষয়ে আপনি যে দ্বিধা দেখিয়েছিলেন, সে কথা আমি তুলছি না।

কলিকাতা এবং সারা বাংলাময় এই গুজব রটেছিল যে স্যার নাজিমুদ্দিনের দল সংখ্যালঘু হলেও. তিনি উচ্চ সরকারিমহল থেকে আশ্বাস পেয়েছিলেন, মৌলবি ফজলুল হককে নয়—তাঁকেই নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের জন্যে আহ্বান করা হবে। এই সব ঘটনার পটভূমিকায় আমি শুধু বলতে চাই যে সাত মাস ধরে আপনি মুসলিম লীগের সঙ্গে যে কোন সর্তে মিট-মাটের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ যে আগ্রহ দেখিয়েছেন তাতে আমি বিস্মিত ও হতাশ হয়েছি। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব-গ্রহণে অস্বীকার করায় হিন্দুদের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে আপনি ততটা উদ্বিগ্ন হন নি। পুলিশের রিপোর্ট অনুসারে প্রধানত হিন্দুদের দ্বারা গঠিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ সরকারি কর্তৃত্বকে দুর্বল করেছে বলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। কিন্তু যদিও মুসলিম লীগ সাত মাস ধরে মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে—বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন নিন্দাত্মক আক্রমণ চালিয়েছে এবং এই ভাবে আইন ও শৃঙ্খলাকে দুর্বল করেছে ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে, তবু আপনি বরাবর বলে এসেছেন ওসব বিরোধী দলের বিধি-সঙ্গত আন্দোলন কিংবা ব্যক্তিগত ভাবে মন্ত্রিবিশেষের বিরুদ্ধে আক্রমণ—যার ফলে সমষ্টিগতভাবে গবর্নমেণ্টের কোন ক্ষতি হয়নি। আপনি মৌলবি ফজলুল হক ও তাঁর সহকর্মীদের এগিয়ে যেতে উৎসাহিত তো করবেনই নি—বরং সময়ে অসময়ে আপনি মুসলিম লীগকে সমর্থন করার প্রয়োজন বোধ করেছেন।

মুসলিম লীগের পক্ষে এই বিশেষ ওকালতি করার জন্য আমরা অনেক সময়ই আপনাকে একটি প্রদেশের নিরপেক্ষ অধিনায়ক বলে ভাবতে পারি নি—মনে হয়েছে মুসলিম লীগ পার্টিরই আপনি যেন একজন ন্যায়নিষ্ঠ হুইপ। প্রকৃতপক্ষে আপনার মনোভাব আমাদের সকলের কাছে রহস্যময় বলে মনে হত। আপনি একথা ভালভাবেই জানতেন, মন্ত্রিমণ্ডলে অন্য কোন দলের যোগদানে আমাদের আপত্তি ছিল না এবং এইভাবে পূরোপুরি জাতীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠনেরও আমরা কিছুমাত্র বিরোধী নই। কিন্তু তাই বলে প্রধানমন্ত্রীর সম্মান ও মর্যাদা খুইয়ে কিংবা প্রগতিশীল কোয়ালিশন দলের সংহতি নষ্ট করে তা করা সম্ভব নয়। মুসলিম লীগ-দলের বক্তব্য ছিল মৌলবি ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী থাকলে তারা মন্ত্রিমণ্ডলে যোগ দিতে পারে না। আমি এ প্রস্তাবের বিরোধী ছিলাম, নেতার প্রতি আনুগত্যই তার একমাত্র কারণ নয়—আমি প্রকৃতই অনুভব করেছিলাম যে এ দাবি মেটাতে গেলে বর্তমান প্রগতিশীল কোয়ালিশন দল যে নীতির ভিত্তিতে গঠিত, সেই মূলনীতিই বিনষ্ট হবে। মৌলবি ফজলুল হককে ঘৃণ্য ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বলি হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তিনি হিন্দুদের মন্ত্রিত্বের ভাগ দিয়েছিলেন বলে গত সাত মাস ধরে তাঁর ভূতপূর্ব সহকর্মী এবং সমর্থকরা তাঁকে ইসলাম-বিরোধী এবং মুসলিম স্বার্থবিধ্বংসী বলে অভিহিত করেছেন। এখন আমাদের বলা হচ্ছে, হিন্দু-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে

আমাদের সঙ্গে কাজ করায় স্যার নাজিমুদ্দিনের আপত্তি নেই—তবে মৌলবি ফজলুল হককে সরে যেতে হবে। আমি কিছুতে আপনাকে বোঝাতে পারলাম না যে এ দাবির পিছনে কোন যৌক্তিকতা নেই—তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর কল্পিত অন্যায়ের জন্য তাঁকে শাস্তি দিয়ে মুসলমান সমাজের সামনে তুলে ধরতে চায়—যদিও ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে মৌলবি ফজলুল হক যে কাজ করে দূরদর্শিতা এবং সাহস দেখিয়েছিলেন, তাঁর সমালোচকরাও ১৯৪২-এর জুলাই মাসে সেই কাজ করতে প্রস্তুত।

মুসলিম লীগকে আধিপত্যের আসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপনি অশোভন উদ্বিগ্নতা দেখিয়েছেন এবং এমন কথাও বলেছেন যে এজন্য প্রয়োজন হলে আপনি মৌলবি ফজলুল হককে "সগৌরবে" বিদায় দেবেন। কিন্তু আমরা জাতীয়তাবাদী জনমতকে সঙ্ঘবদ্ধ করার—বিশেষ করে হিন্দুসম্প্রদায়কে সঙ্ঘ-বদ্ধ করার যে অনুরোধ করছি, সে বিষয়ে আপনি কোন আগ্রহই দেখান নি। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, গ্রেপ্তার ও আটক রাখার নীতি পরিবর্তন কিংবা প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা প্রণীত গৃহরক্ষী-বাহিনীর পরিকল্পনা প্রভৃতি যে সব বিষয় আমাদের মতে বাংলায় হিন্দু এবং মুসলমান জনগণের বৃহৎ অংশের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পেত, অথচ এই প্রদেশের নিরাপত্তাও পুরোপুরি বজায় থাকত, সে সব বিষয়ে আপনার কাছ থেকে বরাবর বাধাই পেয়ে এসেছি।

পরম দুঃখের বিষয়, জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আপনি আপনার বৈধ উপদেষ্টাদের দ্বারা পরিচালিত হন নি—পরিচালিত হয়েছেন স্থায়ী রাজকর্মচারীদের একাংশের দ্বারা। ভারত শাসনতন্ত্রের ৫২ ধারায় আপনাকে যে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার ব্যাপক অর্থ করা চলে—বিশেষ করে এই যুদ্ধের সময়। আপনি এই প্রদেশে গবর্নমেণ্টের মধ্যে অপর একটি গবর্নমেণ্টকে কাজ চালাতে দিয়েছেন। যে সব লোক প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালনা করেছেন, জনসাধারণের সমর্থিত শাসনতন্ত্র-সম্মত গবর্নমেণ্ট-পরিচালনার দায়িত্ব তাঁদের নেই বললেই চলে। এ অভিযোগ অতি গুরুতর। আপনার জানা উচিত যে, সজ্ঞানে হোক কিংবা অজ্ঞানেই হোক আপনি মন্ত্রীদের মনে ঐরূপ দৃঢ় ধারণার সৃষ্টি করেছেন। সুষ্ঠুভাবে প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনার সঙ্গে এরূপ ধারণা আদৌ খাপ খায় না।

মাঝে মাঝে সামরিক কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং সাধারণ আলাপ-আলোচনা ছাড়া—সামরিক প্রশ্নাদি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে মন্ত্রিমণ্ডল অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। গবর্নমেণ্ট-হাউসে আপনার সঙ্গে সামরিক কর্মচারীদের সলা-পরামর্শ হয়েছিল, সেখানে কতিপয় স্থায়ী রাজকর্মচারী উপস্থিত থাকলেও মন্ত্রীদের কেউ উপস্থিত ছিলেন না। এই সঙ্কটের সময় এ ব্যাপারে সহযোগিতা লাভের পূর্ণ অবকাশ ছিল—কিন্তু আপনার দিক থেকে কিছুমাত্র উৎসাহ

দেখা যায় নি। এর কারণ সম্বন্ধে আমার আলোচনা করা প্রয়োজন।

কংগ্রেস ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করলে তার ফলে এ প্রদেশে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে—আমি এখন সেই বিষয়েরই উল্লেখ করব। যুদ্ধের সময় কেউ যদি জনগণের অনুভূতিকে এমন ভাবে নাড়া দেবার পরিকল্পনা করে যার ফলে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা কিংবা বিপত্তি দেখা দেয়, তবে সে সময় যে গবর্নমেণ্ট চালু থাকুক, ঐ পরিকল্পনায় বাধা দেবেই। কিন্তু নিছক দমননীতিতে কোনই প্রতিকার হবে না—যখন দেখা যাচ্ছে যে আন্দোলনকারীরাও জনগণকে বোঝাচ্ছে যে তারাও শত্রুর আসন্ন আক্রমণ প্রতিরোধ করতে চায়—দাস জাতি হিসাবে নয়, স্বাধীনভাবে। কিন্তু দেশের শাসক-কর্তৃপক্ষ দেশবাসীর হাতে প্রকৃত ক্ষমতা প্রত্যর্পণ না করতে কৃতসংকল্প। আমি আপনাকে ইতিপূর্বেই বলেছি, আমাদের স্বার্থের জন্যই আমাদের পক্ষ থেকে জাপানি আক্রমণ প্রতিহত করা আবশ্যক একথা আমি অকপটে বিশ্বাস করি। স্বাধীনতা দানের জন্য জাপান ভারতে আসতে চাইছে না। বিদেশি শক্তি যে ভাণই করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সে প্রভুত্ব বিস্তার এবং শোষণের উদ্দেশ্য ছাড়া কোন দেশ দখল করতে আসে না। আমরা ভারতে কোন বৈদেশিক প্রভুত্ব চাই না। এইজন্যই জাপান এবং হিটলারকে আমাদের শত্রু বলে বিবেচনা করতে হবে এবং তাদের প্রতিরোধ করতে

হবে। ইংল্যাণ্ডের প্রতি ভারতের মনোভাবের কথা আলোচনা করতে গেলে, এই সঙ্কট-মুহূর্তে তাদের পরস্পর সংগ্রাম চালানো উচিত নয়। ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থায়ী করার জন্য এ যুদ্ধ চালানো হচ্ছে না। এ যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন সাম্রাজ্যবাদের পুরাতন আদর্শ সমাধিলাভ করবে, তার আর পুনরুজ্জীবন হবে না। তা যদি না হত, আত্মমর্যাদাজ্ঞান-সম্পন্ন কোন ভারতবাসীই এ যুদ্ধ সম্বন্ধে আদৌ উৎসাহিত হত না। আমি চাই, ভারতে বৃটিশ-স্বার্থের মুখপাত্ররা এই কথা বলুন —বিশেষ করে প্রত্যক্ষ বিপদের সম্মুখীন অঞ্চলগুলোর একতম এই বাংলার ক্ষেত্রে—যে ভারতের স্বাধীনতার অধিকার বৃটেন স্বীকার করে নিয়েছে এবং আমরা সম্পূর্ণ নূতন সম্পর্ক নিয়ে একই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছি। ভারত একা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না, তাকে মিত্রপক্ষের সাহায্য নিতেই হবে।

পুরাতন আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করতে হবে। এমন হাজার হাজার পরিবার আছে যারা মাতৃভূমির সেবা-স্পৃহায় অনুপ্রাণিত হয়ে ছোট বড় নানা বিষয়ে ভারতে বৃটিশ শাসন-যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। আজ আমরা অতীতের বিভিন্নতা নিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে চাই না। আজকের দিনে প্রশ্ন এই—জাপান ও জার্মানির পক্ষ থেকে এই নূতন আক্রমণকে আমরা স-ভারত সমগ্র মানবজাতির স্বাধীনতা বিপন্নকারী বলে মনে করছি কি? বৃটিশ সম্রাটের প্রতিনিধি-

রূপে স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে, অতীত ও বর্তমান রাজনৈতিক কার্যকলাপ নির্বিশেষে প্রদেশের সকল নরনারীকে আহ্বান জানানো আপনার একান্ত কর্তব্য। এই শেষ মুহূর্তেও আমরা জনগণের যুদ্ধ-ফ্রণ্ট গড়ে তুলতে পারব—এবিষয়ে আমি নিশ্চিত ; যে কেউ শত্রুর আসন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত, সে-ই এই যুদ্ধফ্রণ্টে যোগ দিতে পারবে। কিন্তু আপনার বহু স্থায়ী-কর্মচারী এবং তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হয়তো বা আপনিও এই ভেবে ক্ষেপে ওঠেন যে এই সেদিন পর্যন্ত যারা ভারতে ব্রিটিশ-নীতির বিষম শত্রু ছিল, সেই দেশপ্রেমিক বাঙালিদের সহযোগিতা আপনাদের গ্রহণ করতে হবে। আপনি যদি আপনার পদের গুরু দায়িত্ব ভালভাবে পালন করতে চান, তবে আপনাকে রাজনৈতিক বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখতে হবে। আমাকে যদি আমার নিজের পন্থায় কাজ করতে হত, তবে আমি এখনই তাদের সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসতাম এবং তাদের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সহযোগিতার হাত এগিয়ে দিতাম। আমি বলতাম তারা যে আদর্শের জন্য এতকাল সংগ্রাম করেছে, সে আদর্শ বাস্তবে পরিণত হয়েছে—আজ বৃটেন এবং তার ভারতস্থিত প্রতিনিধিরা বৃটেন এবং ভারতের পারস্পরিক সম্বন্ধের ব্যাপারে ভারতের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করে ; কাজেই অতীত সম্বন্ধ নিয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের আর কোন বিরোধ নেই। এখন প্রধান সমস্যা, শত্রুকে

পরাজিত করে আমাদের দেশের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া। শত্রু যদি জেতে, তবে যুদ্ধের পর আমাদের যে স্বাধীনতা পাবার কথা, তা আমরা আর পাবো না।

এই মূল বিষয়ে যদি মতৈক্য হয়, আমি তবে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করব এবং কোন লিখিত চুক্তি না চেয়েই তাঁরা কোথায় কাজ করবেন, তাঁদের কাজের প্রকৃতি কি হবে, তাঁরা কি ভাবে জনগণকে সম্বোধন করবেন, রাজকর্মচারীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কি হবে প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক কর্মতালিকা প্রণয়নে তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা করব। প্রত্যেকটি বিষয়ে অকপট আলোচনা করে বোঝাপড়া হবে। তাঁদের মুক্তি পাবার পর যদি আমরা রিপোর্ট পাই যে তাঁরা আমাদের উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করছেন, শত্রুর পক্ষে সহায়ক হবে এমন কাজকর্ম করছেন, তবে তাঁদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা ও তখনকার নীতি নিয়ে সাহসের সঙ্গে দেশবাসীর সম্মুখীন হওয়া হবে মন্ত্রিমণ্ডলের কর্তব্য এবং দায়িত্ব। শুক্রবারের দিন কলিকাতার কয়েকজন উচ্চপদস্থ পুলিশ-কর্মচারীর সঙ্গে আমার আলোচনার ফলে—বিশেষ করে স্পেশাল ব্রাঞ্চের মিঃ রে-র মতামত থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে অতীত কার্যকলাপের আলোকে বিচার করে এই সব যুবককে আদৌ বিশ্বাস করা চলে না—এই ধারণা এখনও তাঁদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কয়েকজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কার্যকলাপ সম্বন্ধে তাঁর সংগৃহীত গোপন তথ্যের কথাও তিনি উল্লেখ

করলেন। আমি বুঝতে পারলাম, সম্পূর্ণ প্রশ্নটাকে একটা ভ্রান্ত দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচার করা হয়েছে।

বিশ্বাসেই বিশ্বাস জন্মায়। ইতিহাসে অনেক দেখা গিয়েছে, পরস্পর বিবদমান দল একই সাধারণ উদ্দেশ্যে একত্র মিলিত হয়েছে। রাশিয়ার ক্ষেত্রে সম্প্রতি কি ঘটল? রাশিয়া এবং ইংল্যাণ্ড সাধারণ শত্রুকে পরাজিত করবার জন্য দৃঢ়ভাবে এক-সঙ্গে দাঁড়াবে—একথা কি কেউ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে? আজ কি এই দুই দেশের প্রতিনিধিরা তাঁদের অতীত বিভিন্নতা নিয়ে আলোচনা করছেন কিংবা অতীত কার্যকলাপের জন্য পরস্পরের অকৃত্রিমতাকে সন্দেহের চোখে দেখছেন? ইংল্যাণ্ড এবং ভারতের মধ্যেও আজ এমনি পারস্পরিক মনোভাব থাকা উচিত। বাংলাদেশে আমরা সর্বভারতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারি না বটে —কিন্তু আপনার নেতৃত্বে আমরা অবিলম্বে বাংলায় এই পরীক্ষা শুরু করতে পারি; এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত বিরাট সমর্থন পাব। এমন স্থায়ী রাজকর্মচারী যদি থাকেন যাঁরা মনে প্রাণে অনুভব করেন যে এই নূতন নীতিকে কার্যে পরিণত করতে তাঁরা অসমর্থ, তবে তাঁরা বৃত্তি নিয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলে আমাদের এবং তাঁদের উভয়েরই উপকার হবে। এ কথা ভুললে চলবে না যে আমরা একটি প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি—যে যুদ্ধ ইতিপূর্বে বৃটিশ-অধিকৃত কয়েকটি দেশে ধ্বংস-স্তূপ রচনা করেছে। সেই সব দেশের

অধিবাসীদের ট্রাস্টি এবং অভিভাবকরূপে যাঁরা ছিলেন, সেই উচ্চপদস্থ স্থায়ী বৃটিশ রাজকর্মচারীরা আজ কোথায়? তাঁদের অনেকে নিঃশব্দে অত্যন্ত দ্রুত সেই সব দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন—আর সে দেশের অধিবাসীরা এখন শত্রুর হাতে অনন্ত কষ্টভোগ করছে। জাতীয় বিপদের সময় এই প্রদেশের সেবার জন্য কোন বাঙালি যদি আজ সহযোগিতার হাত এগিয়ে দিতে চায়, তবে তাকে কারাপ্রাচীরের আড়ালে রাখার কিংবা তার উপর বিধিনিষেধ করার আরোপ করার অধিকার আপনার নেই। তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের যন্ত্র ঠিকই থাকবে এবং প্রত্যেকের বিষয় পরীক্ষার পর—প্রাচীনপন্থী ঝুনো রাজকর্মচারীরা নন, দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা যদি মনে করেন যে আমরা যাঁদের বিশ্বাস করতে চাই, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকও আছে, তবে মন্ত্রীরাই তখন বিনা দ্বিধায় তাদের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

বর্তমানক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কংগ্রেস-আন্দোলনকে নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। অতীতে এই ধরণের আন্দোলনে শুধু শাসক-শাসিতের সম্বন্ধই ব্যাহত হত। আজ দ্বারে দণ্ডায়মান শত্রুর সম্মুখে এ আন্দোলন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আন্দোলনের বিস্তৃত কর্মতালিকা এখনও প্রকাশিত হয় নি। ওয়ার্কিং কমিটী ঘোষণা করেছেন, বৃটিশ ভারত-ত্যাগ করুক, এই আহ্বান জানানো হচ্ছে। সেই

সঙ্গে ব্যাখ্যা জুড়ে দেওয়া হয়েছে, এই প্রকারের ভারত-ত্যাগের ফলে ভারতে বৃটিশ কিংবা মিত্রপক্ষের সৈন্যদের উপস্থিতি এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম কোন প্রকারে ব্যাহত হবে না। এই ঘোষণার মধ্যে চিন্তা–শৈথিল্য আছে। বৃটিশরা ভারত ছেড়ে গেল ; চলে যাবার সময় ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ভারতীয়দের সঙ্গে চুক্তি করে কিংবা অন্যপ্রকারে কোন গবর্নমেণ্ট বৃটিশদের দ্বারা গঠিত হল না ; প্রত্যেক প্রদেশে এবং কেন্দ্রে জনগণ টেবিলের চারদিকে বসে গবর্নমেণ্ট গঠন করতে লাগল। ওদিকে বৃটিশ সৈন্যদলের ক্ষমতা রইল অব্যাহত। আর এদিকে সব কিছুই আনন্দে চলতে লাগল। ভারতীয় সমস্যা যদি এতই সহজ হত, তবে ভারত বহু পূর্বেই স্বাধীনতা পেত। আজ যদি বৃটিশরা কংগ্রেসের দাবি অনুসারে ভারত ত্যাগ করে, প্রদেশে কিংবা কেন্দ্রে সাধারণের গ্রহণযোগ্য গবর্নমেণ্ট স্থাপিত না হয়ে অনতিবিলম্বে বিশৃঙ্খলা ও গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হবে। হুররা কোন কোন অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করতে পারে এবং অন্যান্য সংগঠিত দলও এই পরিস্থিতির সুযোগ নেবে। সেনানায়কদের কর্তৃত্বাধীন বৃটিশ সৈন্যদলও স্বাভাবিক ভাবে এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চাইবে, এবং এইরূপে তারা সমগ্রদেশে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যদি আরও ভালভাবে ব্যাখ্যাত না হয়, তবে সমস্ত পরিকল্পনা থেকে এমনই নানা বিচিত্র ফললাভের সম্ভাবনা আছে। এইজন্য বুদ্ধিমান লোকেরা এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবে না।

কিন্তু যদি মনে করা হয়, জনগণ সমস্ত পরিকল্পনাটির খুঁটিনাটি বিচার করবে কিংবা বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি নিয়ে এর দিকে তাকাবে, তাহলে বিরাট ভুল করা হবে। এই আন্দোলন সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বায়ত্তশাসন লাভের প্রচেষ্টার প্রতীক হিসাবে গৃহীত হবে। কংগ্রেস ভারতীয়দের কল্পনা এবং দেশাত্মবোধের কাছে আবেদন জানাবে। দেশের সামনে সাধারণ সমস্যাটা হবে কতকটা নিম্নোক্ত রূপঃ যে যুদ্ধ চলছে, আমরা সে যুদ্ধ সমর্থন করতে চাই। কিন্তু আমরা ক্রীতদাসরূপে সমর্থন করতে চাই নে—সমর্থন করতে চাই স্বাধীন জাতিরূপে। মিত্রশক্তি বলে, তারা সম্ভাবিত বিশ্ব-প্রভুত্বকে পশুশক্তির দ্বারা চূর্ণ করতে চায়; কিন্তু যখনই ভারতকে প্রকৃত ক্ষমতা-দানের প্রশ্ন ওঠে, তখনই সকল প্রকারের বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করা হয় এবং ভারত পরাধীন রূপেই বর্তমান থাকে। এই যদি অবস্থা হয় এবং ইংল্যাণ্ড যদি ভারতের সঙ্গে আপোষ করতে অসম্মত হয় তবে এ যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক, এর দ্বারা ভারতের ভাগ্য পরিবর্তিত হবে না। শাসকরা বিশ্বস্বাধীনতা ও বিশ্ব-অগ্রগতির প্রতি মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শন করেও যে ভাবে ভারতের ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করছে, তার বিরুদ্ধে ভারতের অহিংস প্রতিবাদ জ্ঞাপন একান্ত প্রয়োজন।

যুক্তির ধারা হবে এই রকমই।

প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলায় কি ভাবে এই আন্দোলনের প্রতিরোধ

করা যাবে? এই প্রদেশের শাসনকার্য এমনভাবে চালানো উচিত যাতে এই আন্দোলন বাংলায় শিকড় গাড়তে না পারে। আমরা—বিশেষ করে দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা যেন জনগণকে গিয়ে বলতে পারি, কংগ্রেস যে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু করেছে, তা ইতিপূর্বেই জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে এসে গেছে। এটাই সর্বপ্রযত্নে সম্ভব করে তুলতে হবে। কোন কোন বিষয়ে এই স্বাধীনতা হয়তো জরুরি অবস্থার জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে। বৃটেনের জন্য নয়, বৃটিশদের কোন সুবিধার জন্য নয়—নিজ প্রদেশের আত্মরক্ষা এবং স্বাধীনতার জন্যই ভারতীয়দের বৃটিশকে বিশ্বাস করতে হবে। গবর্নর হিসাবে আপনি প্রদেশের শাসনতান্ত্রিক অধিনায়ক থাকবেন এবং আপনাকে পুরোপুরি মন্ত্রিমণ্ডলের পরামর্শ অনুসারে চলতে হবে। স্থায়ী রাজকর্মচারীদের এটা বুঝতে বাধ্য করানো হবে যে মন্ত্রীরা ক্ষমতা এবং দায়িত্ব উভয়েরই অধিকারী। মন্ত্রীদের ডিঙিয়ে তাঁরা আপনার কাছে যেতে পারবেন না কিংবা মন্ত্রীদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপনার নিকট আবেদন করতে পারবেন না। মন্ত্রীরা যে নীতি অনুসরণ করবেন তার সঙ্গে একদিকে যেমন জনগণের প্রকৃত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের যোগ থাকবে, অপরদিকে তেমনই শত্রু-আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার পরম প্রয়োজনেরও যোগাযোগ থাকবে। ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেই শুধু আপনি

বাংলার জনগণের সক্রিয় এবং স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সমর্থন পাবার আশা করতে পারেন।

গণ-আন্দোলনের দ্বারা যারা প্রভাবিত হতে পারে তাদের কর্মক্ষেত্র ও শ্রেণী-বিচার করে এখনই আমাদের দেখতে হবে, তাদের ন্যায্য অভিযোগের কতটা আমরা মেটাতে পারি। আমি কতকটা নিম্নোক্ত উপায় অনুসরণ করতে চাই ঃ

১। মধ্যবিত্ত হিন্দু—এরাই প্রত্যেক রাজনৈতিক সংগ্রামের মেরুদণ্ড বিশেষ। এদের শক্তি চূর্ণ করবার কিংবা কারাকক্ষে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা বৃথা। তাদের মধ্যে কিংবা অন্য কোন শ্রেণীর মধ্যে যদি এমন লোক থাকে, যার সঙ্গে শত্রুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ আছে তবে যথোপযুক্ত তদন্তের পর দায়িত্বশীল মন্ত্রী তার সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। কিন্তু এই ধরণের নেতাদের সংখ্যা খুবই কম। যারা তাদের অনুসরণ করে তাদের অধিকাংশই দেশাত্মবোধের অত্যুগ্রতায় ভেসে যায়। তাদের মনে এখনই এই আবেগময় অনুভূতির সঞ্চার করতে হবে যে, ভারতের স্বাধীনতা ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার; জাপান ভারত অধিকার করতে আসছে, যে কোন মূল্যে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে। ভারতীয়দের উপযুক্ত কাজ এবং দেশসেবার সুযোগ দিতে হবে। উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণাধীনে আমি অবিলম্বে দেশকে সামরিক ভিত্তিতে গড়ে তোলার পক্ষপাতী। বাংলা রক্ষার জন্য অন্তত এক লক্ষ সৈন্য সংগঠনের অনুমতি লাভের

জন্য আমি আপনাকে বারবার অনুরোধ করেছি। যখনই আমি এই প্রসঙ্গ নিয়ে আপনার সম্মুখীন হয়েছি, তখনই আপনি তিনটি আপত্তি তুলেছেন। কিন্তু এই তিনটি আপত্তির কোনটিই বিচারে এক মূহূর্ত টেঁকে না। আপনি বলেছেন, বাংলা তার নিজের বাহিনী গড়তে পারে না। সেটা হয়তো বর্তমান আইন। সে আইন মানুষের সৃষ্টি এবং মানুষ তা ভাঙতেও পারে। উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মানুবর্তিতার অধীনে আমাদের নিজেদের বাহিনী গড়ে তোলার অনুমতি-দান যদি আমাদের সমস্যা-সমাধানের উপায় হয়, তবে এ প্রস্তাবে আপত্তি তোলার কোন অধিকার নেই। দ্বিতীয়ত, আপনি বলেছেন, যে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের অভাব। আমরা চিরদিন এ কথা মেনে নিতে রাজি নই। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ তৈরি করতে হবে, কিংবা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে। অবিলম্বে প্রত্যেককে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া সম্ভব যদি না-ও হয়, বিলম্ব না করে আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। তৃতীয়ত, আপনি বলেছেন যে সামরিক শিক্ষাদাতা নেই। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কিংবা দরকার হলে সাম্রাজ্যের অন্যত্র থেকে শিক্ষাদাতা আমদানি করিতে হবে। এ সমস্ত আপত্তি বাতিল করতে হবে—তা না হলে কংগ্রেসের প্রস্তাবিত আন্দোলন ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি লাভ করবে। আমার দেশ বিপদাপন্ন; আমি চাই মাতৃভূমি-রক্ষার জন্য আমার দেশবাসী অস্ত্র ধারণ করুক। আমি বুঝি যে বর্তমানে বৃটিশ সহযোগিতা নিয়েই

আমাদের তা করতে হবে। এই ধরণের সহযোগিতাকে আমি অভিনন্দন জানাই। দেশের জনগণের এই ন্যায়সঙ্গত কামনা পূর্ণ করতে এত দ্বিধা ও বিলম্ব কেন? বাঙালি পল্টন ব্যর্থ হয়েছিল—সেটা এর কোন উত্তর নয়। আমরা এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থার মধ্যে আমাদের সেনাবাহিনী গঠন করব। আপনার নিজের দেশ যদি বিদেশিরা রক্ষা করত এবং আমরা আপনাদের কাছ থেকে যেমন অজুহাত শুনতে অভ্যস্ত তেমনই অজুহাত যদি আপনাদেরও শাসকদের কাছ থেকে শুনতে হত, তবে আপনারা কি তা পছন্দ করতেন? অবিশ্বাসই হচ্ছে প্রকৃত বাধা। আপনারা ভারতীয়দের এবং বাঙালিদের অস্ত্র দিয়ে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত আছেন কি? এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র অসুবিধা থাকার কথা নয় যদি আপনারা স্বীকার করেন যুদ্ধের পরে এখানে থাকার ইচ্ছা আপনাদের নেই। আপনারা চলে যাবার সময় ইঙ্গ-ভারতীয় আপোষের ফলে ভবিষ্যতে যে জাতীয় গবর্নমেণ্ট স্থাপিত হবে, আমাদের বাহিনী তারই হাতে ন্যস্ত হবে।

ভারতীয় সিপাহী, অভারতীয় সৈন্য এবং অন্যান্য উচ্চ-পদাধিকারীর বেতন সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন আছে। আপনারা বেতন-বৈষম্য রাখেন কেন? আমার ধারণা, একজন ভারতীয় সিপাহী মাসিক ১৬ টাকা এবং একজন অভারতীয় সৈন্য মাসিক ৯০৲ টাকা বেতন পায়। উচ্চপদাধিকারীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। এর ফলে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়

কোন যুক্তি দিয়েই তার নিরাকরণ করা চলে না। বাংলায় যে বাহিনী গঠন করতে চাই, তাতে উপযুক্ত প্রার্থী পেলে সমান সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান থাকবে। আমি মনে করি, আমরা যদি এক সপ্তাহের মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ শুরু করি এবং জনসাধারণের কাছে ঠিকমতো আহ্বান জানাই, তবে আমরা শুধু যে সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পাবো তা নয়, কংগ্রেস তার আন্দোলনের মারফত যে সমর্থন পাবার প্রত্যাশা করছে তারও একটা বৃহৎ অংশ আমরা টেনে নিতে পারব।

২। রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য যাঁরা এখন আটক আছেন বা যাঁদের উপর বিধিনিষেধ আছে, তাঁদের সম্বন্ধে কি করতে হবে—সে কথা আমি আগেই বুঝিয়ে দিয়েছি।

৩। বঞ্চনা-নীতির পিছনে যে সব উদ্দেশ্য আছে, আমি সে সব পুনরায় যাচাই করে দেখতে চাই। আমার মতে, এ কাজটা হয়েছে অত্যন্ত আকস্মিক ও অবিবেচনা-প্রসূত ; এর ফলে উভয় সম্প্রদায়ের হাজার হাজার লোক গবর্নমেণ্টের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছে। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ শুধু অর্থ দিলেই সব ঠিক হয়ে যায় না। যে ভাবে বঞ্চনানীতি অনুসরণ করা হয়েছে, তার কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে? একবার এক মুহূর্তের জন্য ভেবে দেখুন—এর গূঢ়ার্থ কি, এর মধ্যে কত বড় পরাজয়ী-মনোভাবের পরিচয় আছে। আমরা জানি না জাপানিরা কখন বাংলা দেশ আক্রমণ করবে ; কিন্তু এটা বলতে পারি, তারা এখানে একটা কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে। অসহযোগের

ভিত্তিতে গঠিত পরিকল্পনার দ্বারা এ প্রতিরোধ সম্ভব হবে না, প্রতিরোধ হবে মিত্রসেনাবাহিনীর শক্তিশালী আক্রমণাত্মক অভিযানের দ্বারা। কিন্তু তা ঘটবার বহু পূর্বেই জনগণকে তাদের নৌকা, গাড়ি, বাইসিকল প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এর ফলে শুধু যে তাদের বিষম ব্যক্তিগত অসুবিধা হচ্ছে তা নয়—ব্যবসায়-বাণিজ্যও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। আমি সেদিনও বলেছি, একটি জেলার দশ হাজার অধিবাসীকে আমরা অহেতুক বাইসিকল থেকে বঞ্চিত করেছি। তারা কি অতঃপর আমাদের প্রতি বন্ধুত্বের মনোভাব পোষণ করছে? প্রদেশের সর্বত্র যে ব্যাপক অসন্তোষ বিদ্যমান তা কমানোর জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে বঞ্চনা-নীতির পুনর্বিবেচনা অত্যাবশ্যক। শুধুই রেজেস্টারি করা এবং কার্যকরী নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করা হোক—যেন প্রয়োজন হলেই আমরা তা কাজে লাগাতে পারি।

৪। ইভ্যাকুয়েশন অর্থাৎ লোক-স্থানান্তরণ করার নীতিরও সমন্বয়-সাধন প্রয়োজন। বহুক্ষেত্রে এমন ব্যাপার ঘটেছে—সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বাসিন্দাদের স্থানান্তরিত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, কিছু পরেই সামরিক কর্তৃপক্ষ মত বদলেছেন। আপনি নিজেও বহুবার বলেছেন, যাদের স্থানান্তরিত করা হয়, সরকারি ব্যয়ে তাদের পুনঃসংস্থাপনের জন্য একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা রচিত হওয়া উচিত। অবিলম্বে এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

স্থানান্তরিতেরা যখন আবার নিজেদের জমি এবং বাড়ি ফিরে পাবে তখন তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবার নীতিতে সম্মত হবার জন্য ভারত-গবর্নমেণ্টকেও অনুরোধ করা উচিত। ক্ষতিপূরণ দানের উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে কোন কোন স্থানীয় রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে। এর প্রতিকার করতে হবে যারা এই বিষয়ে আন্দোলন করে তাদের গ্রেপ্তার করে নয়, যে সব অভিযোগ আছে সেই সমস্ত বিদূরিত করে।

৫। মূল্য-নিয়ন্ত্রণ এবং নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্ত্র-সরবরাহ —এই সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করছে, এবং এর ফলে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্যের সুবিধা হবে। ভারত-গবর্নমেণ্টকে বুঝতে হবে, সামরিক কার্যে প্রয়োজনীয় জিনিষের মতো খাদ্য-সরবরাহের গুরুত্বও সমধিক বিবেচনা করে যান-বাহনের সুবিধা দিতে হবে। জনকয়েক কর্মচারী নিযুক্ত করলেই সমস্যা মিটবে না। মূল্য-নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যদি সরবরাহের নিকট-সম্পর্ক না থাকে, তবে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ হবে নিতান্ত নিরর্থক।

৬। মূল্য-নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নিজ ব্যবহারের জন্য উৎপাদন-বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্বন্ধেও দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা করতে হবে। এই সমস্যাটি তীব্রতর হওয়ার পূর্বেই কৃষি এবং শিল্পবিভাগ থেকে এ সম্পর্কে বিশেষ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। শ্রমিক-সমস্যা ঃ এক্ষেত্রেও গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে

আক্রমণ চলতে পারে। শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি সাহস ও সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে দেখতে হবে। সকল শ্রেণীর শ্রমিক-নেতাদের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপন করতে হবে এবং তাঁরা যে সাধারণ নীতি অনুসরণ করবেন, সেই সম্বন্ধে চুক্তি করতে হবে। কার্যত সেই নীতি যদি শ্রমিক-নেতারা অনুসরণ না করেন, তবে যথাযোগ্য অনুসন্ধানের পর তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতেও আমাদের দ্বিধা করলে চলবে না। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সদিচ্ছার জন্য একটি পরিকল্পনা রচনার প্রচেষ্টা সর্বপ্রথমে আমাদের করা উচিত।

৮। সম্ভাবিত অর্থনৈতিক দুর্দশা-নিবারণের ব্যবস্থা করতে হবে। এইদিককার একটি প্রধান সমস্যা পাট নিয়ে। মোটামুটি বলতে গেলে পাটের কলগুলোকে যদি বর্তমান হারে মাল উৎপাদন করতে ও পাট জমা রাখতে দেওয়া হয়, তবু রপ্তানি-ব্যবস্থার অবনতির ফলে চাষী এবং মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের হাতে প্রায় পনের থেকে কুড়ি লাখ গাঁইট পাট পড়ে থাকবে। এর ফলে শোচনীয় অর্থ-নৈতিক দুর্দশা দেখা দিতে পারে এবং তার দ্বারা এমন লক্ষ লক্ষ দরিদ্র চাষী মারা পড়বে যারা ইতিপূর্বেই "বঞ্চনা ও স্থানান্তরে প্রেরণ"-পরিকল্পনার ফলে দুর্দশা-ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। ভারত-গবর্নমেণ্টের নির্দেশ অনুসারেই আমরা প্রতি একর জমিতে পাটের উৎপাদন আট আনার নিচে নামাই নি। অতএব বর্তমান উদ্বৃত্ত পাট কিনে

নেওয়া এবং আগামী বৎসরের জন্য তা জমিয়ে রাখার আর্থিক দায়িত্ব ভারত-গভর্নমেণ্টেরই নেওয়া উচিত। যথাসম্ভব শীঘ্র এই বিষয় নিয়ে ভারত-গবর্নমেণ্টের সঙ্গে আলোচনা চালাতে হবে।

৯। অতীতে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রধানত হিন্দুদেরই আকর্ষণ করত। এবার "বঞ্চনা ও স্থানান্তরে প্রেরণ"-পরিকল্পনা এবং সম্ভাবিত পাট-সঙ্কটের দরুন মুসলমান জনগণের মধ্যে অসন্তোষ থাকায় এটা খুবই সম্ভব যে অবস্থা অচিরে খুব খারাপ হয়ে দাঁড়াবে; যে-কোন আন্দোলন গবর্নমেণ্টের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেবে, তারই সঙ্গে যোগ দিতে মুসলমান জনগণও উৎসাহ বোধ করবে।

১০। সরকার-বিরোধীদের প্রতি—বিশেষ করে মুসলিম লীগের প্রতি মনোভাব: আমরা একবার যদি উল্লিখিত খসড়া অনুযায়ী জাতীয় ভিত্তিতে বিস্তৃত ভাবে আমাদের প্রাদেশিক নীতির সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারি, তবে আমরা আরও ভাল ভাবে সকল শ্রেণীর জনমতের সহযোগিতা আহ্বান করতে পারব। সে সহযোগিতা যদি না আসে, তবে আমরা সকলের কাছ থেকে গঠনমূলক নির্দেশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকলেও—যে প্রতিষ্ঠান শুধুই সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক বিদ্বেষ প্রচার করতে চায়, তার বিরোধিতা করতে কুণ্ঠিত হব না। আমরা কয়েকজন বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করতে পারি যাঁদের কাজ হবে সাম্প্রদায়িক বা অন্য প্রকারের অভিযোগের সম্বন্ধে সংবাদ গ্রহণ করা। এই ধরনের প্রত্যেকটি অভিযোগের

বিচার যাতে সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়, গবর্নমেণ্ট সে চেষ্টা করবেন। যুদ্ধের সময় অসন্তোষ-বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে সর্বপ্রযত্নে বাধা দিতে হবে। কিন্তু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দমন করে তা সম্ভব হবে না ; দমন-নীতি অবলম্বন করলে গবর্নমেণ্টের অনুকূলে জনগণের সমর্থন পাওয়া যাবে না। আমাদের ঘোষিত-নীতি এমন হবে, যাতে জনগণ বুঝতে পারে যে সুসমন্বিত কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অধীনে দেশরক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা প্রকৃতই পূর্ণতম মাত্রায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ভোগ করছেন, এবং গবর্নর ও স্থায়ী রাজকর্ম্মচারীরা নিষ্ঠার সঙ্গে সেই নূতন নীতি পালন করে চলেছেন। সেই সাধারণ নীতি-ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত কাজ দেখাতে হবে, যাতে জনগণ বুঝতে পারে যে তাদের অধিকার এবং স্বাধীনতা পূর্ণভাবে রক্ষিত হচ্ছে ; ভারত কিংবা বাংলার উন্নতির পরিপন্থী কোন বিষয়ের জন্য তাদের আর্থিক কিংবা অন্য কোন প্রকার স্বার্থকে ছোট করে দেখা হচ্ছে না। এর সঙ্গে যদি প্রকৃষ্টরূপে অনুসন্ধান ও অভিযোগ-দূরীকরণের জন্য প্রস্তাবিত 'অ্যাড হক'-প্রণালী চালু করা হয়, তবে জনসাধারণের মনোবল ফিরে আসবে এবং যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে তাদের স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতা পাওয়া যাবে। এই সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে, সাম্প্রদায়িক কিংবা জাতীয় বিদ্বেষ প্রচার কিংবা অন্য উপায়ে জনগণকে অযথা উত্তেজিত করার সকল রকম প্রয়াস আমরা দমন করতে পারব।

২। সামরিক নীতিঃ এটা আমাদের কাছে সিলমোহর-করা

বাক্সের মতন, এবং তার ফলে আমরা অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে পড়ি। বিস্তৃত বিবরণ আমরা জানতে চাই না, কারণ সেটা হচ্ছে সামরিক গোপন ব্যাপার। কিন্তু নীতি-ঘটিত সাধারণ প্রশ্নে নিশ্চয়ই আমাদের পরামর্শ নিতে হবে। আপনি আমাদের এই সুচিন্তিত অভিমতটা যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিন যে শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা করে কখনও আমরা এ যুদ্ধ জিততে পারব না। পরিকল্পিত আক্রমণাত্মক নীতির ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ এবং সাহসিক অভিযান চালাতে হবে—তা নইলে শত্রুপক্ষ পরাজিত হবে না। এটা সত্যই বিস্ময়কর যে, শত্রু-বিমান বাংলার ভিতরে চট্টগ্রামে এসে বোমা ফেলল, তখন তাদের ভারত-সীমান্ত থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য কোন চেষ্টাই হয় নি। শত্রু-বিমান পূর্ববঙ্গ এবং আসামের বিস্তৃত অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল—তবু তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হয় নি বললেই চলে। জনসাধারণের মনোবলের উপর এ নীতির ফল অত্যন্ত মারাত্মক। সিঙ্গাপুর মালয় ও ব্রহ্মের পতনের পর সাধারণত লোকে মনে করে এখানেও বড় রকমের যুদ্ধ চালানোর ইচ্ছা ইংরেজের নেই ; বাংলার ভাগ্যে হয়তো ব্রহ্মেরই মতো দুর্ভোগ আসবে। মিত্রপক্ষে বড় ধরনের কয়েকটি বিজয় হলেই আপনা থেকে জনগণের মনোবল পুনরুজ্জীবিত হবে। যাই হোক, জীবন এবং সম্পত্তি-ধ্বংসী শত্রু-বিমানের আক্রমণ-সংবাদের পরেই যদি শত্রু-বিমানের উপর আমাদের প্রত্যাক্রমণ ও তার ফলে তাদের ক্ষতির বিবরণ প্রকাশিত হয়, তবে আবার

জনগণের মনোবল ফিরে আসবে। সেনাবাহিনী যত ভাল বেতন পাক এবং যত সুসজ্জিতই হোক, তাদের মধ্যে এমন একটা ধর্মোন্মাদনা আবশ্যক, যার জোরে তারা পশ্চাদপসরণ করবে না, যে পবিত্র ভূমি রক্ষার জন্য তারা আহুত হয়েছে, তার এক ইঞ্চি ছেড়ে না দিয়ে তারা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবে। এ না হলে বিজয় লাভ পর্যন্ত বর্তমান যুদ্ধ চলতে পারে না। এই পবিত্রতার ভাব নিজ মাতৃভূমির সেবাবৃত্তির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট থাকে, এ আপনা থেকে আসে—ভাড়াটে মাইনে-করা সেনা-বাহিনীর কাছ থেকে এ বস্তু পাওয়া যায় না। দেশের সন্তানদের দ্বারা গঠিত সেনাবাহিনীর কাছ থেকেই এই প্রেরণা প্রত্যাশা করা যায়। গৌরবময় পশ্চাদপসরণের যে নূতনতম সমর-কৌশল, তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা সর্বদাই থাকে। এর চেয়ে, শক্তিশালী শত্রুকে আঘাত করতে প্রবৃত্ত আত্মঘাতী রুশ-স্কোয়াডের কথা শুনতে আমরা বেশি ভালবাসি। চীন এবং রাশিয়ার বীর সৈন্যরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হয়, তখন তারা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে, পবিত্র স্মৃতি-রঞ্জিত স্বাধীন দেশের বুকের উপর তারা দাঁড়িয়ে আছে ; সে-দেশ যুগ যুগব্যাপী উত্তরাধিকার সূত্রে তারা লাভ করেছে। এই অবস্থায় তারা স্বতঃই অনুপ্রেরণা অনুভব করে ; শত্রুকে জিততে দেওয়ার চেয়ে তারা শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিয়ে মৃত্যুবরণ করতে কৃতসংকল্প হয়। এই কারণেই সর্বান্তঃকরণে আমি আপনাকে বলছি, অবিলম্বে বাঙালি স্থল, নৌ ও বিমান-বাহিনী সংগঠনের ব্যবস্থা করুন,

এবং নিজ-দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই তাদের আহ্বান করুন।

যে মনোভাব এ চিঠি লিখিবার জন্য আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে আশা করি, তা আপনি বুঝতে পারবেন। ভবিষ্যতের গর্ভে আমাদের জন্য কি সংরক্ষিত আছে কেউ তা জানে না। ভারতবর্ষের এবং বিশেষ করে এই প্রদেশের সঙ্কট-মুহূর্তে আপনার অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে আমি আন্তরিক সহযোগিতা করতে ও দেশসেবা করতে ইচ্ছুক। উপরে যে সব সর্তের উল্লেখ করেছি, সেগুলো সাধারণ ধরনের; কোন বাধা-সৃষ্টির জন্য সেগুলোর উল্লেখ করা হয় নি। যা-ই হোন না কেন, আপনারা বিদেশি; প্রত্যাসন্ন আক্রমণের মধ্যে মাতৃভূমির সেবায় ভারতবাসী কি ভাবে আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায়, আলোচ্য সর্তগুলি তারই নির্দেশক। যে জীবন্ত শক্তি ছাড়া এই যুদ্ধে জয়লাভ আদৌ সম্ভব নয়, বর্তমান শাসনতন্ত্রের ফলে তাদের বিকাশ কি ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়—এই সব সর্ত থেকে তা-ও বোঝা যাচ্ছে। এই সর্ত পরিপূরণের জন্য পার্লামেন্টের কোন আইনের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন, শুধু উদার রাজনৈতিক বুদ্ধির—যার ফলে বড়লাট ও আপনি গণতন্ত্রসম্মত সুষ্ঠু বিধি সংস্থাপন করতে পারেন এবং প্রদেশের শাসনতান্ত্রিক কর্তা রূপে বর্তমান থেকে আপনি বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে উল্লিখিত গুরুত্ব-পূর্ণ সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারেন। অবশ্য

দেশরক্ষা-বিষয়ক ব্যাপারে স্পষ্টতই ক্ষমতা হবে সীমাবদ্ধ ধরণের।

এই পত্রের যে উত্তর আপনি দেবেন, তার উপর আপনি ও বড়লাট মাঝে মাঝে যে সব ঘোষণা করেছেন, সেই সকলের অকৃত্রিমতা প্রমাণিত হবে; তা ছাড়া—আমার প্রদেশের ভবিষ্যৎ সর্বাঙ্গীণ কল্যাণও তার উপর নির্ভর করবে। এই কথা বলে আমি শেষ করতে চাই, আমি চেয়েছি যুদ্ধের সময় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আপনাদের সঙ্গে ক্ষমতার অংশ গ্রহণ করুক। এ ক্ষমতা আপনারা অকুণ্ঠে দিতে পারবেন যদি আপনাদের মনে প্রকৃতই এই ধারণা থাকে যে এ-যুদ্ধ একদিকে পশুশক্তি ও প্রভুত্ব-লিপ্সা অপর দিকে মানুষের প্রগতি ও স্বাধীনতার পরস্পর-বিরোধী আদর্শবাদের যুদ্ধ, এবং আপনারা শেষোক্তটিরই অনুকূলে দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

মাননীয় স্যার জন হার্বার্ট
বাংলার গবর্নর

বশম্বদ
শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১২ আগস্ট, ১৯৪২

প্রিয় লর্ড লিনলিথগো,

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পুনর্বিবেচনার জন্য আপনার কাছে এবং আপনার মারফত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে আমি সাগ্রহ আবেদন জানাচ্ছি। ভারতের মঙ্গল সম্বন্ধে প্রকৃত আগ্রহশীল কেউই চায় না যে অক্ষশক্তি এ-যুদ্ধে জয়লাভ করুক। কেন না বিশ্ব-স্বাধীনতার পক্ষে—বিশেষ করে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে—তাদের বিজয় হবে বিপদের কারণ। যুদ্ধ-জয়ের জন্য এবং ভারতের জনমত ও বিরাট সমরসামর্থ্যকে সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য অবিলম্বে ভারতের স্বাধীন রাজনৈতিক পদমর্যাদা লাভ অত্যাবশ্যক। যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাবে—একথা ঘোষণা করাই আপনাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। অবিলম্বে স্বাধীনতা ও সমান পদমর্যাদা লাভ অবাস্তব অধিকারের অভিব্যক্তি মাত্র নয়—সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধচালনার অত্যাবশ্যক সর্ত্তও বটে। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের অধীনে প্রাদেশিক মন্ত্রী রূপে আমার অভিজ্ঞতা থেকে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে বর্ত্তমানের যে শাসন-ব্যবস্থা বৃটিশ প্রতিনিধিদের হাতে নাকচ করার চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়েছে এবং যার মধ্যে মন্ত্রীদের ন্যায়সঙ্গত কাজে হস্তক্ষেপের অবকাশ আছে, তার

দ্বারা দেশের যুদ্ধকালীন প্রয়োজন মিটতে পারে না। আত্ম-রক্ষার জন্য সুসংবদ্ধ নীতি নির্ধারণ ও তা কার্যে পরিণত করার শক্তি যদি জাতীয় গবর্নমেণ্টের না থাকে, তবে ভারত-রক্ষার জন্য বিরাট আয়োজন কখনই ভাল ভাবে করা যেতে পারে না। ব্রহ্মের শিক্ষা থেকে চিন্তাশীল বৃটিশ রাজনীতিবিদ্‌দের চোখ খোলা উচিত। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় বৃটিশ-শক্তি সে দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করছিল ; অতি সহজেই সেই শক্তি ভেঙে পড়ল। যখন বৃটিশরা দেখতে পেল, শত্রুর মহত্তর শক্তির কাছে নতি স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, তারা তখনই সে দেশ ছেড়ে চলে গেল। স্বাধীন দেশ রূপে ব্রহ্ম যদি বৃটেন ও অন্যান্য মিত্রশক্তির সঙ্গে পূর্ণতম সহযোগিতায় কাজ করতে পারত, তবে জনগণ ও তাদের প্রতিনিধিরা পশ্চাদপসরণ করত না; তারা প্রতি ইঞ্চি জায়গা রক্ষার জন্য রক্ত দান করত। তারা বিবেচনা করত, দেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য যে কোন মূল্য দেওয়া পবিত্রতম কর্তব্য। কাজেই অবিলম্বে ভারতের স্বাধীন পদমর্যাদা স্বীকার করে নেওয়া অত্যাবশ্যক, এবং আসন্ন আক্রমণে শুধু বৃটিশদের উপর নির্ভর না করে মিত্রশক্তির সহযোগিতায় নিজেদের দেশ-রক্ষার জন্য ভারতীয় জনগণকে আহ্বান করা উচিত।

কংগ্রেসের সাম্প্রতিক প্রস্তাবে যে দাবি রূপ পরিগ্রহ করেছে, প্রকৃতপক্ষে সেই দাবি সারা ভারতের জাতীয় দাবি। এটা পরিতাপের বিষয় যে, কোন কোন বিদেশি পত্র-পত্রিকায় এই

মর্মে অপপ্রচার করা হচ্ছে যে, কংগ্রেসের দাবিতে জাপানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, এবং বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রাটের হাতে আত্মসমর্পণ করা হয়েছে। কেউই চায় না যে গণ-আন্দোলনের ফলে ভারতে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি হোক। কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যদি জনগণের প্রকৃত দাবি মানতে অস্বীকার করে প্রকৃত রাজনীতি-বোধের পরিচয় না দেন, তবে তার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হবেই। তাঁদের এই অবিবেচনা-প্রসূত কাজের দ্বারা তাঁরাই ভারতে সঙ্কট-সৃষ্টি করবেন; কংগ্রেসের তাতে কিছুমাত্র দায়িত্ব থাকবে না। শৃঙ্খলা ভঙ্গ হতে পারে বা অশান্তি হতে পারে—এমন কিছু অকস্মাৎ না করা যেমন কংগ্রেসের কর্তব্য, তেমনি আপনাদেরও কর্তব্য অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে এমন অসন্তোষ ও বিক্ষোভের কারণ বর্তমান না রাখা। এই সঙ্কট-মুহূর্তে দমন-নীতি প্রতি-কারের উপায় নয়। স্বাধীনতার সংগ্রামে রত সকল দেশের ইতিহাসে দেখা যায়, শাসক-শক্তি যতই দমননীতির আশ্রয় নেয়, নিজেদের নির্যাতিত ও নিপীড়িত বিবেচনা করে জনগণের প্রতিরোধ-শক্তিও তত বেড়ে যায়। দমন-নীতির ভীষণতায় আপনি বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হয়তো চাপা দিতে পারবেন (অসাধারণ শক্তি প্রয়োগ না করলে তা-ও কঠিন হবে, আর ভারতের জন-মানসে তার প্রতিক্রিয়া হবে অত্যন্ত মারাত্মক), কিন্তু তার ফলে বিক্ষোভ গুপ্তরূপ নেবে এবং সরকার-বিরোধী—বিশেষ করে ব্রিটিশ-বিরোধী

মনোভাব সারা ভারতে ব্যাপকতা লাভ করবে। এইভাবে শত্রুর উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাদের মাথাব্যথা নেই, তারা চায় ভারতের বিশৃঙ্খল অবস্থা। উপযুক্ত মুহূর্তে শত্রু এই অবস্থার পূর্ণতম সুযোগ নিতে কসুর করবে না। প্রকৃত পক্ষে দমননীতির বেপরোয়া প্রয়োগ এবং ভারতের ন্যায়-সঙ্গত দাবি পালনে ব্যর্থতার জন্য শত্রুকেই আমরা হয়তো বৃটিশ অত্যাচারীর হাত থেকে মুক্তিদাতা বলে মনে করব। এইরূপ মনোভাব নিয়েই ভারতের বহুজন একদা ভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে প্রায় দু'শ বছর পূর্বে আপনাদের পূর্ব-পুরুষদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। তারাই কালক্রমে বণিকের ভূমিকা ত্যাগ করে ভারতের মালিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাজেই আমি আপনাকে ভারতীয় পরিস্থিতি বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে অনুরোধ করি। দ্রুত-পরিবর্তনশীল বিশ্বঘটনাপুঞ্জের আলোকে অবস্থার বিচার করতে হবে। ভারতীয় বর্তমান শাসন-ব্যবস্থায় কেউ সন্তুষ্ট নয়; ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা অবসানের জন্য অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা আবশ্যক। কংগ্রেসের দাবির মূল কথা এ ছাড়া আর কিছু নয়। কংগ্রেস-নেতাদের মনে এ ছাড়া অন্য কোন গোপন উদ্দেশ্য আছে, এ কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নই। যদি থাকে, তবে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্বন্ধে আপনাদের গঠনমূলক প্রস্তাব ভারতের জনসমাজে ঘোষিত হলেই, তার স্বরূপ ধরা পড়ে যাবে।

বৃটিশ গভর্নমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করতে অস্বীকৃত হয়েছেন—বৃটিশ গভর্নমেণ্টের এই সিদ্ধান্ত সব চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় বলে বিবেচিত হবে। গান্ধীজি খুব জোরের সঙ্গে এই ভরসা দিয়েছিলেন, সম্মানজনক আলোচনার সমস্ত উপায় না দেখে আন্দোলন শুরু করা হবে না। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস আন্দোলন শুরুই করে নি—বৃটিশ-নীতিই সঙ্কট এগিয়ে নিয়ে এসেছে। বর্তমান পরিস্থিতির এটা একটা উল্লেখযোগ্য দিক ; এর জন্যে অনুশোচনা না করে পারা যায় না।

রাজনৈতিক অচল-অবস্থা ভারত ও বৃটেন উভয়েরই পক্ষে সমান বিপজ্জনক। এর অবসানের জন্য আমি আপনাকে অবিলম্বে মনোনিবেশ করতে অনুরোধ করি। সম্মানজনক ইঙ্গ-ভারতীয় আপোষের ভিত্তিরূপে কয়েকটি পরীক্ষামূলক প্রস্তাব আমি করছি ঃ

১। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ঘোষণা করা উচিত, ভারতের স্বাধীনতা লৌকিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

২। ভারতে জাতীয় গভর্নমেণ্ট-গঠনের জন্য বিভিন্ন ভারতীয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা চালানোর ক্ষমতা বড়লাট কিংবা বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের অন্য কোন প্রতিনিধিকে দেওয়া হোক, এবং এই জাতীয় গভর্ণমেণ্টের হাতে অবিলম্বে শাসন-ক্ষমতা তুলে দেওয়া হোক।

৩। ভারতের জাতীয় গবর্নমেণ্ট অক্ষ-শক্তির বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করার সংকল্প ঘোষণা করবেন এবং শত্রুর সঙ্গে এই গবর্নমেণ্ট পৃথক কোনপ্রকার সন্ধি করবেন না।

৪। মিত্রপক্ষীয় সমর-পরিষদে ভারতের প্রতিনিধি থাকবেন এবং ভারতের সামরিক নীতি এই পরিষদের নির্ধারিত সামরিক নীতির অনুগামী হবে।

৫। প্রধান-সেনাপতি ভারতের যুদ্ধ-ঘটিত কার্যকলাপে কর্তৃত্ব করবেন এবং মিত্রপক্ষীয় সমর-পরিষদের সাধারণ নীতি কার্যে পরিণত করবেন।

ভারতের জাতীয় গবর্নমেণ্ট একটি ভারতীয় বাহিনী গঠন করতে পারবেন যার উদ্দেশ্য হবে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা-রক্ষায় সাহায্য করা এবং বিদেশি আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশ-রক্ষা করা।

৬। জাতীয় গবর্নমেণ্ট সর্বদলীয় হবে; দেশের সব উল্লেখযোগ্য দল ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা তার মধ্যে থাকবেন। প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টগুলিও অনুরূপ ভিত্তিতে গঠিত হবে।

৭। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলের সদস্যপদ শুধু ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না— দেশে প্রভাব আছে এমন বাইরের লোকও মন্ত্রিমণ্ডলের সদস্য হতে পারবেন। যুদ্ধের সময় তাঁদের কাছে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যেতে পারবে।

৮। ভারতবর্ষ যাতে ভাল ভাবে যুদ্ধ চালাতে পারে তদুদ্দেশ্যে ভারতের জাতীয় গবর্নমেণ্ট যন্ত্র-শিল্পের অগ্রগতি

ও অর্থ-নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে সক্রিয় নীতি অবলম্বন করবেন।

৯। • ইণ্ডিয়া-অফিস বিলুপ্ত করা হবে।

১০। ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র নির্ধারণের জন্য ভারতের জাতীয় গবর্নমেণ্ট একটি গণপরিষদ গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন। গ্রেট-বৃটেন এবং ভারতের মধ্যে একটা সন্ধি হবে, তার মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠদের অধিকার-সম্পর্কিত বিশেষ ধারা থাকবে। কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার জন্য ইচ্ছা করলে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের কাছে মীমাংসার জন্য আবেদন জানাতে পারবে। এই ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ভারত গবর্নমেণ্ট এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

বৃটিশ-সম্রাটের প্রতিনিধি রূপে ভারতের সমস্যা-সমাধানের জন্য বৃটিশ গবর্নমেণ্টের উচিত, আপনাকেই পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া। যে সব মূল-নীতির ভিত্তিতে ইঙ্গ-ভারতীয় আপোষ হওয়া সম্ভব, আমি উপরে তারই একটা সংক্ষিপ্ত খসড়া দিয়েছি। অন্যান্য প্রস্তাবও অবশ্য করা যেতে পারবে। কিন্তু আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করার পূর্বে বৃটিশ-গবর্নমেণ্টকে ক্ষমতা-হস্তান্তর সম্বন্ধে মনস্থির করতে হবে।

এই জাতীয় প্রস্তাবের ফল কি হতে পারে সে সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। আপনি কংগ্রেস-নেতাদের মুক্তি

দেবেন এবং সন্ধির আহ্বান জানাবেন। ভারতের মতো একটা বিরাট দেশের শাসক হয়ে এই জাতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করলে প্রগতিশীলতারই পরিচয় দেওয়া হবে। মিত্রশক্তি-পুঞ্জ যে আদর্শের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং সমগ্র পৃথিবীকে রক্তবন্যায় ডুবিয়েছে, তার সঙ্গে এই প্রস্তাবের সামঞ্জস্য আছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যদি মতৈক্য হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং জাগ্রত ভারত নিজের ও মিত্রশক্তিপুঞ্জের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সমরায়োজনের পরিকল্পনা নিয়ে মেতে উঠবে। এরূপ অবস্থায় কোন দলেরই বোধ করি বাধাদান-মূলক মনোভাব অবলম্বনের দুঃসাহস হবে না। যারা ক্ষমতা ও দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে আপনাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে। একবার যদি জানা যায় যে আপনারা ক্ষমতা হস্তান্তর সম্বন্ধে মনস্থির করে ফেলেছেন—এবং বিশেষ কোন দল যতই বড় বা শক্তিশালী হোক, তার বাধা-দান আপনারা সহ্য করবেন না, তখন স্বাভাবিক সুবুদ্ধি ও স্বার্থের জন্য প্রত্যেক দলই একমত হয়ে উপরোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে। অসহযোগী দলগুলি ব্যবস্থা নাকচ করবার তাদের যে কৃত্রিম ক্ষমতা—সঙ্গে সঙ্গেই তা হারিয়ে ফেলবে। এ রকম কোন দল যদি বাধা দেয় ও অসহযোগিতা করে, তবে জাতীয় গবর্নমেণ্ট যখন শাসন-রজ্জু ধারণ করবেন এবং গ্রেট-বৃটেন ও মিত্রশক্তিপুঞ্জের সদিচ্ছা নিয়ে ভারতের অগ্রগতির জন্য নূতন

সেবাব্রত শুরু করবেন, তখন আপনা থেকেই সেই দল পিছনে পড়ে যাবে। অবৈধ কার্যকলাপ কিংবা শত্রুপক্ষের প্রতি অনুকূল মতিগতির জন্য যদি সে দলের অস্তিত্ব বিলুপ্তও করতে হয়, তার দায়িত্ব আপনাকে কিংবা বৃটিশ গবর্নমেণ্টকে নিতে হবে না—ভারতের জাতীয় গবর্নমেণ্টই সে দায়িত্ব নেবেন। এর পূর্ববর্তী সত নিশ্চয় এই হবে যে ভারতের জন্ম-স্বত্ব যে স্বাধীনতা—সেই স্বাধীনতা সম্পূর্ণতঃ অর্পণ করে গবর্নমেণ্টকে আপনাদের শক্তিশালী করে তুলতে হবে। বর্তমান সঙ্কটের কথা বিবেচনা করে প্রগতি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ রক্ষায় নিযুক্ত অন্যান্য জাতির সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করে সেই স্বাধীনতা আমরা ভোগ করব।

আজ ভারতের জনমত দাবি করছে, বৃটিশ গবর্নমেণ্ট অলসভাবে বসে থেকে শুধু বৃটিশ বেয়নেটের দ্বারা আর ভারত-শাসন করতে পারবে না। আপনারা যদি ভারতবর্ষ এবং মিত্রপক্ষকে বাঁচানোর জন্যে উদ্‌গ্রীব হন, তবে আমাদের সঙ্গে আপোষেরই চেষ্টা করতে হবে। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করার ক্ষমতা আমাদের হাতে তুলে না দিলে কোন ব্যবস্থাই আজ ভারতকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। শত্রু পরাজিত হতে বাধ্য—এ কথা অনুভব করতে ভারতবাসী নিশ্চয়ই চায়; কিন্তু শত্রু জয়ী হতে পারে, এটাও সম্ভাবনার একেবারে বহির্ভূত নয়। তেমন ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতের পক্ষে আবার নূতন দাসত্বের জীবন শুরু হবে।

যদি সে শোচনীয় দুর্ঘটনাই ঘটে, তবে বৃটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাবে এবং আমাদের. শাসন-যন্ত্রও ভেঙে পড়বে। যে জাপানী বেয়নেট আজ ব্রহ্মের বুকে রাজত্ব করছে, তখন তার থেকে উদ্ধার করার জন্য ভারতের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীদের মঙ্গলকামনায় অস্থির ভারত-সচিবের সাক্ষাৎ মিলবে না। আপনারা ঘোষণা করেছেন, যুদ্ধের শেষে আপনারা ভারত ছেড়ে চলে যাবেন, ভারতের স্বাধীনতা আপনারা স্বীকার করে নেবেন। আমরা মনে করি যে আপনাদের ঘোষণা সার্থক করার জন্য এবং যে-যুদ্ধ আপনাদের মতো আমাদেরও, সেই যুদ্ধ-জয়ের জন্য যুদ্ধকালেই ভারতের স্বাধীন পদ-মর্যাদা স্বীকার করে নেওয়া অত্যাবশ্যক। অবশ্য কোন বুদ্ধিমান ভারতবাসীই এ প্রস্তাব সমর্থন করবে না যে এই সঙ্কট-সময়ে ভারত থেকে সব ব্রিটিশেরই চলে যাওয়া উচিত। আমাদের সম্মিলিত সব শক্তি নিয়ে সাধারণ-শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। যা আমরা চাই সে হচ্ছে অন্তর্বর্তী কালের জন্য ভারত এবং বৃটেনের মধ্যে উদার ভিত্তিতে সংস্থাপিত সামঞ্জস্য; আমরা চাই স্বাধীন-ভারতের শাসক ভারতীয় জাতীয় গবর্নমেন্ট—যে গবর্নমেন্ট বৃটেন ও মিত্রশক্তি-পুঞ্জের সঙ্গে ঐক্য ও সহযোগিতায় কাজ করে বিশ্বস্বাধীনতা রক্ষার জন্যে সাধ্যানুযায়ী দান করবে। ক্রিপ্‌স মিশন ব্যর্থ হয়েছিল—তার প্রধান কারণ সে মিশনের প্রস্তাবে অবিলম্বে আমাদের কিছু দেবার ছিল না; অন্যান্য যে সব কারণ ছিল

তা নিয়ে আমার আলোচনার প্রয়োজন নেই। ক্রিপ্‌স-প্রস্তাবে আমাদের যেন একটি ব্যাঙ্কের উপর দূর-তারিখের চেক দেওয়া হয়েছিল যে ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ অবস্থা ছিল একেবারেই অনিশ্চিত। মিত্রশক্তিপুঞ্জের সঙ্গে সংযুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষই কেবল ভারত ও অবশিষ্ট পৃথিবীকে বাঁচাতে পারে।

আমি বাংলার গবর্নরকে জানিয়েছি যে বর্তমান সঙ্কট-মুহূর্তে বৃটিশ-গবর্নমেণ্ট ও তাঁদের প্রতিনিধিরা যে নীতি অনুসরণ করছেন, আমি তা অনুমোদন করি না। আমি আপনার কাছে আবেদন করছি, আপনি মিথ্যা মর্যাদা-বোধকে পথ রোধ করে দাঁড়াতে না দিয়ে রাজনৈতিক অচল-অবস্থা অবসানের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন। যদি আপনি মনে করেন, এই অচল-অবস্থা বজায় রাখা ছাড়া বৃটিশ-গবর্নমেণ্টের অন্য কোন কর্তব্য নেই, তবে আমি দুঃখের সঙ্গে গবর্নরকে অনুরোধ করব, তিনি যেন আমাকে মন্ত্রী-পদ থেকে মুক্তি দেন—যাতে আমি আপোষ-দাবি জানানোর জন্য জনমত-সংগঠনের পূর্ণ স্বাধীনতা পাই। আমি আগ্রহ ও আশা পোষণ করছি যে বিলম্বিত হলেও উভয় পক্ষ সংঘর্ষ বন্ধ করবে এবং সমস্ত দল একটা আপোষ-রফায় পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। সে আপোষ-রফা সকলের পক্ষেই সম্মানজনক হবে এবং যে যুদ্ধ মানবীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদানগুলোকে ধ্বংস করতে উদ্যত, সেই যুদ্ধ-জয়ে আমাদের সাহায্য করবে। ভারতে

বৃটিশ-সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে আপনি এই সঙ্কট-সমাধানে শক্তি ও যোগ্যতার পরিচয় দিন—এই আমার কামনা।

যারা ভারতে বৃটিশ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করছে তাদের এবং ভারতীয়দের একটা বিরাট অংশের অভিমত আমার পত্রে প্রতিফলিত হয়েছে বলে, আমি আপনাকে এই পত্র বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স এবং ভারত-সচিবের কাছে পাঠাতে অনুরোধ করছি। বৃটিশ-গবর্নমেণ্ট যাই করুন না কেন, এই সঙ্কট সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব তাঁরা যেন বুঝতে পারেন।

বশম্বদ

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মাননীয় লর্ড লিনলিথগো

ভারতের বড়লাট

(৪)

১৬ নভেম্বর, ১৯৪২

প্রিয় স্যার জন,

আমি মন্ত্রী-পদ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করেছি। আমার পদত্যাগ-পত্র নিয়মমাফিক প্রধানমন্ত্রীর মারফৎ আপনার কাছে পাঠানো হচ্ছে। তাঁর কাছে লেখা আমার চিঠির একটা নকল এই সঙ্গে দেওয়া হল। যে সব ঘটনার ফলে আমি এই পন্থা অবলম্বন করলাম, এই পত্রে আমি তার একটা বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে চাই।

প্রায় এক বৎসর পূর্বে আমি যখন এই পদ গ্রহণ করেছিলাম, তখন কাজের অসুবিধা সম্বন্ধে আমি পূর্ণ-সচেতনই ছিলাম। তখন সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের যেরূপ প্রাবল্য ছিল, এ প্রদেশের ইতিহাসে সেরূপ আর কখনও দেখা যায় নি। যুদ্ধ-পরিস্থিতিও দ্রুত গুরুতর আকার ধারণ করছিল; দেশরক্ষা-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য গবর্নমেণ্ট এবং জনগণের সম্মিলিত সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন ছিল। আমার কার্যকালে আমি সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া সুস্থ ও শান্তিময় রাখবার জন্য চেষ্টা করেছি। আমার বিশ্বাস, শাসনকার্য ন্যায়-সঙ্গত ভাবে পরিচালিত হচ্ছে—এই অনুভূতি যদি প্রধান দুইটি সম্প্রদায়ের মনে না দেখা দেয়, তবে বাংলাদেশের অগ্রগতি কখনো হতে পারে না। আমি এই অভিমত পোষণ করি, ভারতের নিজের স্বার্থের জন্যই আমাদের

জাতীয় যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সবল ও সতেজ করে তুলতে হবে। কিন্তু দেশরক্ষার অনুকূলে দেশের জনমত সংগঠিত করার উপায় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি সর্বদা আপনার সঙ্গে একমত হতে পারি নি।

গত মার্চ ও জুলাই মাসে আপনার কাছে লেখা চিঠিতে আমি যে সব প্রসঙ্গের আলোচনা করেছি, এখানে তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আমি বার বার কি ভাবে গবর্নমেণ্টের বর্তমান বন্ধ্যা-নীতি পরিবর্তন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি তা বুঝতে হলে এই চিঠির সঙ্গে আগেকার চিঠিগুলোও পড়তে হবে।

মোটামুটি বলতে গেলে, আমার পদত্যাগের কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত, আমি সর্বপ্রথম সুযোগে—৯ই আগস্ট তারিখেই আপনাকে জানিয়েছিলাম যে বৃটিশ-গবর্নমেণ্ট ও ভারত-গবর্নমেণ্ট দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করেছেন, আমি তা অনুমোদন করি না। আমি জানি, প্রাদেশিক গবর্নর হিসাবে এই নীতি-নির্ধারণে আপনার কোন দায়িত্ব নেই। কিন্তু আমার দ্বিতীয় কারণের সঙ্গে আপনিই প্রধানত সংশ্লিষ্ট। সেটা হচ্ছে, আমার মতে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত ভাবে, আপনি মন্ত্রিমণ্ডলের কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনকে প্রহসনে পরিণত করেছেন। নিখিল-ভারতীয় কোন সিদ্ধান্তের জন্য আপনাকে দায়ী করা না গেলেও আপনি যথার্থ রাজনীতি-

বোধের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে এবং বিশ্বাস ও সহযোগিতার সাহসিক প্রত্যক্ষ নীতি অনুসরণ করে বাংলার শাসনের ধারা বদলে দিতে পারতেন। এর ফলে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সুস্থ আবহাওয়ার সৃষ্টি হত এবং বর্তমান যুদ্ধে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী এই প্রদেশের নিরাপত্তা সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

সংক্ষেপে আমি দেশের সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখ করতে চাই। বড়লাটকে লিখিত আমার পত্রে আমার মনোভাবের পূর্ণ পরিচয় আছে। কিন্তু আশঙ্কিত কংগ্রেস-আন্দোলন সম্পর্কে ভারত-গবর্নমেন্টের নির্ধারিত নীতির সংবাদ পেয়ে আপনি যে অস্বাভাবিক উপায়ে কাজ করেছিলেন, আমি এখানে তারই বর্ণনা করব। ভারত-গবর্নমেন্টের কাছ থেকে চীফ-সেক্রেটারির কাছে চিঠিটা আসার পর আপনি সেটা প্রধানমন্ত্রীকে দেখিয়েছিলেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তখন প্রধানমন্ত্রী ঠিকই বলেছিলেন যে গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে ভারত-গবর্নমেন্টের নির্ধারিত নীতি নিয়ে মন্ত্রিমণ্ডলের পূর্ণ আলোচনা হওয়া উচিত। আপনি ভেবে চিন্তে সে উপদেশ প্রত্যাখ্যান করলেন—এমন কি প্রধানমন্ত্রী যাতে তাঁর সহকর্মীদের চিঠির বক্তব্য না বলেন, সে জন্যও তাঁকে অনুরোধ করলেন। অথচ কতিপয় স্থায়ী রাজকর্মচারী চিঠিটা দেখেছিলেন, এবং নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে তাঁরা ব্যস্ত হলেন। আপনি স্থির করেছিলেন, কংগ্রেস-নেতাদের গ্রেপ্তারের পর প্রকৃত

পক্ষে ভারত-গবর্নমেণ্টের নীতি কার্যে পরিণত হয়েছে—এই মর্মে ভারত-গবর্নমেণ্টের নিকট থেকে ঘোষণা পাবার পরেই শুধু মন্ত্রিমণ্ডল আলোচ্য পত্র নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। কিন্তু ঐ অবস্থায় আলোচনা একেবারে নিরর্থক—কেন না তার ফলে মন্ত্রিমণ্ডল মতামত লিপিবদ্ধ করে ভারত-গবর্নমেণ্টের বিবেচনার জন্য পাঠানোর সুযোগ পাবেন না।

৯ই আগস্ট বোম্বাইয়ে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর অবশেষে আপনি আমাদের একত্র ডেকে বলেছিলেন, ঐ নীতি গ্রহণ করতে অথবা পদত্যাগ করতে। তখন আমি জানিয়েছিলাম, আপনার কাজ বিধি-বহির্ভূত ; এর ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন পরিহাস মাত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আপনার প্রত্যাশা ছিল, মন্ত্রিমণ্ডল সামগ্রিক দায়িত্বের ভিত্তিতে আপনার পাশে দাঁড়াবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পরামর্শ-গ্রহণ যখন একেবারে নিরর্থক, সেই সময় ছাড়া আপনি এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের বিশ্বাস করতে এবং তাঁদের পরামর্শ নিতে চান নি। সেইদিনই আমি জানিয়েছিলাম, ভারত-গবর্নমেণ্টের এ নীতি আমি অনুমোদন করি না—কেন না আমি গভীরভাবে অনুভব করি, যুদ্ধের সময় নির্মম দমননীতির দ্বারা দেশের বুকে ভীতি-সৃষ্টির প্রয়াস না করে ভারতীয় সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক সমাধানের জন্য বৃটিশ-গবর্নমেণ্ট এবং তাঁদের ভারতস্থিত প্রতিনিধিদের প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। সে সময় আমি পদত্যাগ করি নি—তার কারণ আমি আপনাকে

জানিয়েছিলাম যে, ঐ বিষয়ে আমি বড়লাটকে পত্র লিখতে ইচ্ছা করি। সেই চিঠি ১১ই আগস্ট তারিখে আপনার মারফৎ পাঠানো হয়েছিল ; সেপ্টেম্বরের প্রথমে দিল্লী থেকে ফেরবার পর আমি তার উত্তর পাই। আমার বিশ্বাস, বৃটিশ-গবর্নমেণ্টের কাছেও আমার চিঠি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বর্তমান অচল-অবস্থা অবসানের জন্য গবর্নমেণ্টের তরফে কোন আগ্রহই নেই। ইত্যবসারে আমি চুপচাপ বসে ছিলাম না—আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে অবিলম্বে মীমাংসার অনুকূলে জনমত সংগঠনের প্রয়াস পেয়েছিলাম। আমি ও অপর কয়েকজন যে পন্থা অবলম্বন করেছিলাম, দেশের জনমতের প্রতিনিধিদের এক বিরাট অংশ খোলাখুলি ভাবে তা অনুমোদন করেছিল। আমি কংগ্রেস ছাড়া আর সমস্ত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলেরই সংস্পর্শে এসেছিলাম ; মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস-নেতাদের সঙ্গে আমি সাক্ষাতের অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু বড়লাট আমার অনুরোধ না-মঞ্জুর করেছিলেন।

আমি বরাবর অনুভব করে এসেছি, বর্তমান অচল অবস্থা অবসান করানোর প্রধান দায়িত্ব গবর্নমেণ্টেরই। গবর্নমেণ্ট যে পর্যন্ত ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা-অর্পণের জন্য মনস্থির না করবেন, সে পর্যন্ত কিছুতেই অচল-অবস্থার অবসান হবে না। অবিলম্বে কেন্দ্রে ও প্রদেশে মিত্রশক্তির সাধারণ-নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং দেশরক্ষার নীতি অনুকরণকারী সর্বদলীয় গবর্নমেণ্ট স্থাপন ভারতের কল্যাণের পক্ষে

যেমন প্রয়োজন, মিত্রশক্তিপুঞ্জের পক্ষেও তেমনই প্রয়োজন। নিজ জন্মভূমিতে ইংরেজের মতো আমরাও ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে নিজেদের বিবেচনা করতে চাই। বৃটিশ মুখপাত্রেরা বলেন, ভারতে ঐক্যের অভাব। সেটা মিথ্যা অজুহাত মাত্র। অতীতে কোনও রাজনৈতিক অগ্রগতিকে ভারতের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্যের উপর নির্ভরশীল বলে বিবেচনা করা হয় নি। পুরাতন ভেদনীতির দ্বারা শাসনের খেলা না খেলে বৃটিশ-গবর্নমেণ্ট যদি প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তর করতে সিদ্ধান্ত করেন, তবে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের স্বার্থেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তর করা সত্ত্বেও যারা একতাবদ্ধ হবে না, তারা আপনা থেকেই পিছনে পড়ে যাবে। আসল কথা এই, বৃটিশ-গবর্নমেণ্ট যে কোন মূল্যে ভারতকে নিজের তাঁবে রাখতে চান। ভারতের দাবি অত্যন্ত সরল। ক্রীতদাস কোন মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সর্বান্তঃকরণে যুদ্ধ করতে পারে না। ভারতবর্ষ সর্বাগ্রে চায় স্বাধীন দেশ রূপে পরিগণিত হতে ; তার-পর অক্ষশক্তির আক্রমণের হাত থেকে মানব-সমাজের মুক্তির জন্য অন্যান্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে সে একযোগে যুদ্ধ করতে চায়। আপনারা নিজ দেশে এত দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীনতা ভোগ করে আসছেন যে নির্যাতিত নিপীড়িত পরাধীন দেশের মনোভাব পুরোপুরি বুঝতে পারেন না। প্রাচ্যের জনগণের মনে দেশ রক্ষার জন্য জ্বলন্ত উৎসাহের সঞ্চার করতে পারে নি বলে প্রাচ্যে বৃটিশ শাসনাধীন বহু অঞ্চল এই

সঙ্কট-মুহূর্তে বৃটিশের হস্তচ্যুত হয়ে গেছে। স্বাধীনতার জন্য মরতে যাবার আগে পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া আবশ্যক। পরম দুঃখের বিষয় এই যে, বৃটিশরা এখনও ভারতীয় জনগণের সম্বন্ধে একই ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

বৈদেশিক প্রভুত্ব (এর মধ্যে বৃটিশ-প্রভুত্বও পড়ে) ঝেড়ে ফেলে নিজের দেশকে স্বাধীন দেখার ইচ্ছা যদি অপরাধ হয়, তবে প্রত্যেক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ভারতবাসীই অপরাধী। ভারতে এমন শাসকও আছেন, যাঁরা সর্বদা মনে করেন যে ভারতের শহর ও গ্রামের পথে-ঘাটে পঞ্চম-বাহিনীর লোকেরা অহরহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভারতের প্রকৃত স্বার্থের বিরোধিতা যদি ভারতীয় পঞ্চম-বাহিনী বিচারের মাপকাঠি হয়, তবে ঐ সকল মাননীয় ভদ্রমহোদয় নিজেরাই এই দলে পড়েন। জাপান কিংবা অন্য কোন অক্ষশক্তির প্রতি ভারতের জনসাধারণের অধিকাংশেরই কোনপ্রকার সহানুভূতি থাকতে পারে না। আমরা ভারতীয়রা জাপানকে এদেশে আমন্ত্রণ করতে উৎসুক হব কেন? আমরা কেবলমাত্র চাই, আপনারা নিরাপদে এবং যথাসম্ভব শীঘ্র দেশে ফিরে যান। সর্বব্যাপী প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য এক সতেজ সক্রিয়-শক্তি, অতৃপ্ত ভোগ-স্পৃহাসম্পন্ন নূতন প্রভুকে আমরা অভ্যর্থনা জানাব—এর পিছনে যুক্তি কোথায়? বিদেশি শাসনের হাত থেকে আমরা পুরোপুরি মুক্তি পেতে চাই। আমরা চাই, এ দেশ আমাদের হোক; আমরাই এ দেশ শাসন করি। ভারতবর্ষ বহুকাল ধরে নিজেকে

সাম্রাজ্যিক লোভের যূপ-কাষ্ঠে বলি দিয়ে এসেছে। দয়াবান অছি হয়ে থাকবার যে নীতি, তার ফাঁকি আজ ধরা পড়ে গেছে—আপনারা আর আমাদের চোখে ধূলো দিতে পারবেন না। ভারতীয় প্রতিনিধিরা তাই দাবি করেন, রাজনীতি অর্থনীতি জাতীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই শাসন-ব্যবস্থা ভারতবাসী নিজেরাই নির্ধারণ করবে—হৃদয়হীন আমলা-তন্ত্র এবং অযোগ্য গবর্নররা বিরক্তিকর ভাবে তাদের কাজে বাধা দিতে পারবেন না। ভারত এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে এখনও পারস্পরিক সাহায্য ও বিশ্বাসের যথেষ্ট অবকাশ আছে—আজ উভয় দেশ একই আশঙ্কার সম্মুখীন। আমরা স্বীকার করি, বর্তমান যুদ্ধে আমাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা উচিত; একপক্ষে ভারত এবং অপর পক্ষে ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য মিত্রশক্তির মধ্যে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অংশভাগিতার দ্বারাই কেবল আমরা শত্রুকে দেশের বাইরে রাখার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারি, এবং এইরূপে মিত্রপক্ষীয়দের স্বার্থরক্ষা করতে পারি। ভারতীয়দের যদি উপলব্ধি করতে না দেওয়া হয় যে তারা স্বাধীন, যে-কোন মূল্য দিয়ে সেই স্বাধীনতা তাদেরই রক্ষা করতে হবে—তবে রাশিয়া ও চীনের মতো ভারতকে আবেগ-উত্তপ্ত একাগ্র সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা কোনরূপে সম্ভব হবে না।

এইপ্রকার স্বাভাবিক হৃদয়াবেগের সঙ্গে মিত্রশক্তির ঘোষিত যুদ্ধ-নীতির পরিপূর্ণ মিল আছে। আপনারা নূতন বিশ্ববিধানের

জন্য আগ্রহান্বিত; মানুষের স্বাধীনতা আর কখন যাতে বিপন্ন না হয়, সেই ব্যবস্থা আপনারা করতে চান। এ উক্তি যদি অকৃত্রিম হয়, তবে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়ে স্বার্থত্যাগ করতে এবং এই ভাবে ভণ্ডামির অপরাধ থেকে নিজেদের বাঁচাতে আপনারা এত দ্বিধান্বিত কেন? যা ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক সেই পন্থা গ্রহণ না করে তিন মাস ধরে গবর্নমেণ্ট দমনমূলক শাসন চালাচ্ছেন। যারা গভীর ভাবে এক-নায়কত্বের প্রতি আসক্ত, যাদের কৃতকার্য্যর নিন্দা বৃটিশ এজেন্সিগুলির মারফৎ ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে, তাদের কাছেই কেবল এই শাসন-পদ্ধতি আদর্শ রূপে বিবেচিত হবে। এই কয়মাসে জনগণ বুলেট-ভীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করেছে। ভারতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখার জন্য আপনারা অতঃপর আর কি করবেন? অসন্তোষ ও তিক্ততায় ভারতবর্ষ আজ ছেয়ে গেছে। যে জাতি নিরস্ত্র এবং আত্মরক্ষার উপায়-বিহীন, তার সঙ্গে যুদ্ধ করা সহজতম কাজ। কোন কোন বৃটিশ-মুখপাত্র বলেছেন, ভারত—অন্ততপক্ষে ভারতের অংশবিশেষ যুদ্ধ-ঘোষণা করেছে। তাঁদের যদি সেই বিশ্বাসই হয়ে থাকে, তবে ভারতীয়দের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হোক, এবং সমান সমান অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ চলুক। আজকের দিনে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর লক্ষণ,—ঘটনাপ্রবাহ ক্রমশ যে-গতি নিচ্ছে, তাতে ভগ্নোৎসাহ জনগণ বর্তমান অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য যে কোন পরিবর্তনকেই অভ্যর্থনা জানাবে।

পরিতাপের বিষয়, যাঁরা ভারত-শাসনের জন্য দায়ী তাঁরা এই সহজ সত্য ভুলে গেছেন যে বৃটেন কখনও একযোগে ভারত ও অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। রাজ-নীতিবোধ একেবারে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে বলে ভারতীয় পক্ষের শুভেচ্ছা এবং সহযোগিতাকে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের খাতে প্রবাহিত হতে দেওয়া হয়েছে। বহু শাসক তাঁদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন; জাতি হিসাবে ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষ তাঁরা কিছুতে চেপে রাখতে পারেন না। আমি বলছি না যে, গত তিনমাসের মধ্যে যে সব অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নাশকতামুলক কাজ করা হয়েছে তার দ্বারা আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভে সহায়তা হবে। উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ করা হোক। কিন্তু এইটাই একমাত্র সমস্যা নয়। একটা বিষবৃত্তের মধ্যে হিংসা এবং প্রতিহিংসা ঘোরাফেরা করছে, আর এর ফলে দেশের আবহাওয়া আজ একেবারে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। আপনারা ভারতীয় বিক্ষোভের মূল-কারণ ধরতে পারেন নি। ভারতে আবার শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে আমাদের স্বাধীনতার ক্ষুধা মেটাতে হবে। ভারতের ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা-পূরণের জন্য গঠনমূলক প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে অস্ত্রশক্তির দ্বারা কিংবা সন্ত্রাসবাদের নীতির দ্বারা বিশৃঙ্খলার বাহ্যিক অভিব্যক্তি দমন করতে গেলে বৃটেন এবং ভারতের মধ্যে ব্যবধানই শুধু বেড়ে যাবে। এর ফলে উভয় দেশের কারও পক্ষে মঙ্গল হবে না কিংবা বিশ্ব-স্বাধীনতারও

অগ্রগতি সাধিত হবে না। শুধু বেয়নেট দেখিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতকে ধরে রাখা চলবে না। ইংল্যাণ্ড এবং এখানকার সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত বৃটিশরা এবং আমেরিকা ও চীনের প্রভাবশীল জনমতের কিয়দংশ সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু শক্তি ও পদমর্যাদার মিথ্যা অভিমান যুক্তি ও ন্যায়ের কণ্ঠরুদ্ধ করে রেখেছে।

এখানেই চিঠি শেষ করে আপনার নিজের কু-শাসনের ফলে পরিস্থিতি যে কতদূর খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে তার উল্লেখ না করলে হয়তো শোভন হত। আপনাকে যেভাবে এই প্রদেশের শাসন-কার্য চালাতে দেখেছি তার সম্বন্ধে আমার হতাশা এবং অসন্তোষ আমি জুলাই মাসে আপনাকে লেখা চিঠিতে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করছি। বাইরে সদিচ্ছার ভাব দেখালেও আপনি প্রতি পদে বিভ্রাট বাধিয়েছেন। ১৯১৯-এর শাসন-সংস্কারের পর বাংলায় এই প্রথম একটি মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়েছে যার পিছনে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরাট অংশের সমর্থন আছে। রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক নীতির দিক থেকে যে সব রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি ভীষণভাবে পরস্পরবিরোধী ছিল, তারাই প্রদেশের মঙ্গলের জন্য—বিশেষ করে যুদ্ধের সঙ্কট-সময়ে—একই মঞ্চে এসে দাঁড়াতে সম্মত হয়েছে। স্বদেশে এবং বিদেশে উচ্চ পদাধিকারী এমন কতিপয় ব্যক্তি আছেন যারা সুস্পষ্ট কারণেই হিন্দু এবং মুসলমানের দৃঢ় সংহতি পছন্দ করেন না।

আমরা যে সহযোগিতা দিতে চেয়েছিলাম আপনি এবং কতিপয় স্থায়ী রাজকর্মচারী সে বিষয়ে উৎসাহ দেখান নি। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, আমাদের সঙ্গে আপনার প্রথম যোগাযোগের সময় থেকেই আপনি প্রাদেশিক গবর্নরের উপযুক্ত পক্ষপাতিত্বহীন উচ্চতার শিখরে উঠতে পারেন নি। তা যদি পারতেন, তবে আপনি জনসাধারণের বিশ্বাস ও প্রীতি অর্জনের জন্য শাসনতন্ত্রের মর্যাদারক্ষা, নূতন আদর্শ সংস্থাপন এবং প্রাদেশিক শাসনের ভিত্তি বিস্তৃত করার সাহস ও দূরদর্শিতা দেখাতেন। আপনি সর্বদাই নিজেকে একদল স্থায়ী রাজকর্মচারীর দ্বারা পরিচালিত হতে দিয়েছেন। আপনার মতে, তারা প্রভুভক্ত—আর আমাদের মতে, অদূরদর্শী ও প্রতি-ক্রিয়াশীল। এর ফলে গবর্নমেণ্টের মধ্যে আর একটি গবর্ন-মেণ্টের সৃষ্টি হয়ে প্রদেশের স্বার্থ বিপন্ন করেছে।

আমি বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে যেতে চাই না। কিন্তু যখনই কোন ক্ষেত্রে আপনার কাছে জনসাধারণের অধিকার-স্বীকারের প্রস্তাব গেছে, আপনি কোনপ্রকার সহানুভূতি দেখান নি। মূলগত অবিশ্বাস এবং সন্দেহের দরুনই আপনি সে সব প্রস্তাব নাকচ করেছেন। আমাদের বঙ্গীয় বাহিনী-সংগঠনের প্রস্তাব আপনার কাছে যে জন্য গ্রহণযোগ্য হয় নি, তা আদৌ যুক্তিসহ নয়। এ প্রস্তাব কার্যকরী হলে বাংলার জনমতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটত। মন্ত্রিমণ্ডলের সর্ববাদীসম্মত উপদেশ সত্ত্বেও গৃহরক্ষী-বাহিনী বা হোমগার্ডকে জনপ্রিয়

করার পরিকল্পনা আপনি নাকচ করেছিলেন; জনসাধারণকে বিশ্বাস করতে আপনি এবং আপনার কর্মচারীরা ভয় পেয়েছিলেন। আপনি মন্ত্রিমণ্ডল বিস্তৃত করার জন্য পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারি নিয়োগ ও মন্ত্রীদের সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রস্তাবের বরাবর বিরোধিতা করেছেন। কংগ্রেস-আন্দোলন শুরু হবার পূর্ব থেকেই সন্দেহক্রমে কিংবা রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ-গ্রহণের অপরাধে যে হাজার হাজার বাঙালিকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাদের মুক্তি দিতে আপনি অস্বীকৃত হয়েছেন, যদিও যুদ্ধ-পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা তাদের ভবিষ্যৎ আচরণ ও কার্য-কলাপ সম্বন্ধে পূর্ণ দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে ব্যক্তি-বিশেষের মুক্তি—এমন কি সাময়িক দণ্ড-শৈথিল্যের কোন নির্দেশ আমরা দিলে আপনি তা-ও নাকচ করে দিতেন। "বঞ্চনা-নীতি"র ব্যাপারে যে হাজার হাজার নরনারী কষ্টে পড়বে এবং দেশব্যাপী অসন্তোষের সৃষ্টি হবে—আপনি তা বুঝতে পারেন নি। আমাদের বহুচেষ্টার ফলে সে নীতি সামান্য মাত্রই পরি-বর্তিত হয়েছিল। শত্রু আক্রমণ করলে কারখানা যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সম্পত্তি-ধ্বংসের জন্য কি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, আমরা এখনও তা জানি না। খাদ্য-সরবরাহ এবং সরবরাহ-নিয়ন্ত্রণ-ঘটিত ব্যাপারেও আপনি মন্ত্রিমণ্ডলের কাজে অযথা হস্তক্ষেপ করেছেন এবং আমাদের

কাজ অত্যন্ত কঠিন করে তুলেছেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত-গ্রহণের সময়ে আপনি, মন্ত্রিমণ্ডলে সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ-চেষ্টা ব্যাহত করেছেন, কর্মচারী-নির্বাচন ও তাঁদের কার্যে নিয়োগ ব্যাপারে মন্ত্রীদের উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেছেন। বর্তমান বিরোধী-দলের প্রতি আপনার নির্লজ্জ সহানুভূতির সঙ্গে বিগত মন্ত্রিমণ্ডলের সময় আমরা যখন বিরোধী-দলে ছিলাম, তখন আমাদের প্রতি আপনার আচরণের বৈষম্য লক্ষণীয়। এমন কি, ব্যবস্থা-পরিষদের গত অধিবেশন স্থগিত রাখার মতো সাধারণ প্রশ্নেও আপনি আমাদের উপদেশ গ্রহণ করতে চান নি। প্রকৃত পক্ষে, শুধু মন্ত্রিমণ্ডলকে বিব্রত করার জন্যই আপনি ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন স্থগিত না রাখবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তার ফলে এ প্রদেশের অনেক বাজে ব্যয় হয়েছিল, ইচ্ছা করলে তা বন্ধ করা যেত। এই বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি অক্টোবরের প্রথমে আপনাকে যে চিঠি লিখেছিলাম, আপনার কাছ থেকে সে চিঠির কোন জবাব অদ্যাপি আমি পাই নি। জনসাধারণের অধিকার এবং স্বাধীনতা-ঘটিত ব্যাপারে আপনি নিজেকে চূড়ান্ত নির্দেশদাতা বলে মনে করেন; ভারত গবর্নমেণ্টের শাসনতন্ত্রে আপনাকে যে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তারই বলে আপনি কাজ করেন—এই আপনার দাবি। আমি পুনঃপুনঃ আপনাকে বলেছি, এ পরিস্থিতি অবাস্তব। যুদ্ধের সময় আপনি যদি নিজেকে প্রধানত এই প্রদেশের জন-

গণের কাছে দায়ী বলে মনে করেন এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপদেশ অনুসারে চলেন—তবেই আপনি সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে পারবেন। কিন্তু আপনি নিজেকে সকল নিয়ন্ত্রণের বাইরে বলে মনে করেন। আপনার ক্ষমতা আছে, অথচ আপনি অন্য কারও কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নন। যুদ্ধ-বিষয়ক কিংবা রাজনৈতিক পরিস্থিতি-বিষয়ক ব্যাপারে মন্ত্রীরা জনমত জাগিয়ে তুলতে তেমন ভাবে সক্রিয় নন—এ নিয়ে আপনি সময় সময় বিরক্তি প্রকাশ করেছেন; নিজেদের বিচার-বুদ্ধির আলোকে মন্ত্রীরা শাসন-কার্য পরিচালনা করবেন—এ আপনি হতে দেবেন না। আপনি এবং আপনার কতিপয় কর্মচারী গবর্নমেণ্টকে এমন কতকগুলি নীতি ও কাজের মধ্যে জড়িয়ে ফেলছেন মন্ত্রীরা যা কিছুতেই অনুমোদন করতে পারেন না। অথচ আপনারা চান, মন্ত্রীরা নিতান্ত অনুগত ভাবে আপনাদের ভ্রান্ত নীতি সমর্থন করবে। আক্রমণের বেশির ভাগই গিয়ে পড়ে মন্ত্রীদের উপর; আপনার আচরণ সম্বন্ধে সমালোচনা কিংবা মন্তব্য প্রকাশ করবার অধিকার ব্যবস্থা-পরিষদেরও নেই। আর আপনার দিক থেকে আপনি ভারত-গবর্নমেণ্টের আইন এবং শাসনবিষয়ক নির্দেশের সুযোগ নিতে—এমন কি তার বাইরে যেতেও দ্বিধা বোধ করেন না। এর ফলে মন্ত্রীদের শাসন প্রহসনে পরিণত হয়।

কিন্তু সব চেয়ে কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক

আন্দোলন দমনের উপায় নিয়ে। আপনাকে আমি পুনঃ পুনঃ একথা বলেছি যে আইন-বহির্ভূত কাজ যাতে না হতে পারে কিংবা যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ জরুরি পরিস্থিতিতে আন্দোলন সৃষ্টি যাতে হতে না পারে, এ সমস্ত দেখা নিশ্চয়ই গবর্নমেণ্টের কর্তব্য। কিন্তু ইচ্ছা করে সঙ্কট ডেকে আনা—কিংবা কর্মচারীরা যাতে অত্যাচার করতে পারে, নির্দোষ জনগণকে অযথা যন্ত্রণা দিতে পারে, এ ভাবে তাদের উৎসাহিত করা—কখনো গবর্নমেণ্টের কর্তব্য নয়। লোকে ভেবে চিন্তে অপরাধ করলে আইনের নিগ্রহ তাদের সহ্য করতে হবেই। কিন্তু আমাদের যথাসাধ্য বাধাদান সত্ত্বেও নির্বিচারে ধরপাকড় করা হয়েছে, নির্দোষ লোকদের নির্যাতিত করা হয়েছে, গুলি মারা হয়েছে; কোন কোন ক্ষেত্রে এমন ভাবে দমন-কার্য চলেছে যে সেটা যে-কোন সভ্য গবর্নমেণ্টের পক্ষে আদৌ শোভন নয়। জার্মান নিয়ন্ত্রণাধীনে কয়েকজন বৃটিশ যুদ্ধ-বন্দীকে শিকল পরানো হয়েছিল বলে বৃটিশ-গবর্নমেণ্ট এবং তার সমর্থকদের মধ্যে ক্ষিপ্ত প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। আর সেই বৃটিশ গবর্নমেণ্টেরই চরেরা যে ভারতীয়দের উপর অধিকতর শোচনীয় অনাচার করছে, তার জন্য আপনি কি সামান্যতম নৈতিক উষ্মাও দেখাতে পারেন না? যে সব ব্যাপার প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, তার তদন্ত করতে আপনি অনবরত অস্বীকার করেছেন; প্রকৃত সংবাদ প্রকাশ বন্ধ রাখতে আপনি সহায়তা করেছেন।

মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলে রাজনৈতিক আন্দোলন

গুরুতর আকার ধারণ করেছিল, এ কথা সত্য। কোন লোক আইন-বহির্ভূত গুরুতর অপরাধ করলে তার বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বন সম্বন্ধে কারও কিছু বলবার থাকে না। কিন্তু মেদিনীপুরে এমন দমননীতি চলেছে, তার সঙ্গে কেবল জার্মান-অধিকৃত দেশে জার্মানদের কার্যকলাপেরই (বৃটিশ এজেন্সি প্রচারিত) সাদৃশ্য পাওয়া যায়। পুলিশ এবং সেনা-বাহিনীর লোক হাজার হাজার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। নারীর উপর অত্যাচারের সংবাদও আমাদের কাছে এসেছে। হিন্দুদের বাড়ি লুঠতরাজ করতে মুসলমানদের উত্তেজিত করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলার যারা রক্ষক তারা নিজেরাও অনেক ক্ষেত্রে ঐ কাজ করেছে। কলিকাতা থেকে অবশ্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আইন-শৃঙ্খলার রক্ষকরা বাড়ি পুড়িয়ে দেবে—এটা সরকারি নীতি নয়। কিন্তু এ নির্দেশ মান্য করা হয় নি, তা প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট সাক্ষ্য আমার কাছে আছে। ১৬ই অক্টোবরের সাইক্লোনে অভাবিতপূর্ব ধ্বংসলীলা সংঘটিত হল; তার পক্ষাধিক কাল পরে আমরা ঐ সব অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলাম। এত বড় দুর্ঘটনার পরও এই জেলার কোন কোন অঞ্চলে বাড়িঘর-পোড়ানো ও লুঠতরাজ চলছিল। যে ভাবে লোকদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, সে প্রসঙ্গ বাদ দিলেও গবর্নমেণ্টের চরগুলোর দ্বারা অনুষ্ঠিত এই সব অনাচার অত্যন্ত ঘৃণ্য ধরনের। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে যারা বে-আইনি কাজ করেছে, সকল উপায়ে আমরা

তাদের কাজের নিন্দা করব। কোন রাজকর্মচারীর তারা প্রাণনাশ করেছে বলে আমি তো জানি না। যাই হোক, একপক্ষ অন্যায় করেছে বলেই যে আইন ও শৃঙ্খলার ধারকরা নির্দোষ জনসাধারণকে নির্যাতন করবে, নির্মমভাবে সকলের উপর নিপীড়ন চালাবে—এটা কোনক্রমে সমর্থন করা যায় না।

সাইক্লোনের পরেও কোন কোন রাজকর্মচারীর শৈথিল্য ও ঔদাসীন্য সম্বন্ধে আমি যেসব বিবরণ পেয়েছি. সভ্যদেশের শাসনের ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। গবর্নমেণ্ট যে পক্ষকাল ধরে ধ্বংসলীলার সংবাদ চেপে রেখেছিলেন—এমন কি সাহায্যের আবেদন পর্যন্ত প্রকাশিত হতে দেওয়া হয় নি—এটা জঘন্যতম অপরাধ। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে এমন অভিযোগও এসেছিল যে, সেদিনের সেই ভয়াবহ সন্ধ্যায় এবং তার পরেও যেসব লোক ঘরের চালে আশ্রয় নিয়ে কোনক্রমে টিকে ছিল, তাদের জীবন-রক্ষার জন্যও নৌকা দেওয়া হয় নি। ঐসব চাল শেষ পর্যন্ত ভেঙে ধ্বসে পড়েছিল। এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটি হৃদয়বিদারক কাহিনী শোনা গেল—তিনি ও অন্য কয়েকজন লোক একটি নৌকা জোগাড় করেছিলেন। দু-ঘণ্টার জন্য নৌকাটা নিয়ে গিয়ে বিপন্ন অঞ্চলের জনকয়েক পুরুষ নারী ও শিশুকে উদ্ধার করার জন্য তাঁরা সরকারি কর্মচারীদের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। এ প্রার্থনাও নামঞ্জুর হয়েছিল। আর এই বলে শাসানো হয়েছিল, যারা নৌকা ব্যবহার করবে তাদের দুর্ভোগ

ভুগতে হবে। যাদের এঁরা উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, তারা ভেসে অদৃশ্য হয়ে গেল, তাদের আর খোঁজ পাওয়া যায় নি। সাইক্লোনের পরে সর্বত্র সান্ধ্যআইন জারি হয়েছে—যে সব অঞ্চলের জনগণ পূর্ণ সহযোগিতা করেছে, সে সব অঞ্চলেও। এ বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ করেও কিছু করতে পারি নি। পক্ষাধিক কাল পরে যখন আমরা ঐ জেলা পরিদর্শন করেছিলাম, তখনও যানবাহনের চলাচল ছিল অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ। ভারতরক্ষা-বিধান জারি করে লোকের গরু কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। বন্যা এবং ঝড়ের ফলে যত গৃহপালিত পশু মরেছিল তাদের পরিমাণ শতকরা ৭৫ থেকে ৮৫র মধ্যে হবে। এর পরেও যে গাভী অবশিষ্ট ছিল তার অধিকাংশই—সবৎসা ও দুগ্ধবতী হলেও—সৈন্যদের ভোজনের জন্য গৃহস্থের বাড়ি থেকে পুলিশ ও সৈন্যরা জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে। এ ধরনের অমানুষিক নির্দয়তার সত্যই তুলনা নেই। গবর্নমেণ্টের কাছে লেখা এক রাজপুরুষের বিবরণ থেকে জানা যায়, তাঁর মতে এক মাসের জন্য সরকারি বেসরকারি সর্বপ্রকার ত্রাণকার্য বন্ধ রেখে জনসাধারণকে চিরদিনের মতো একটা শিক্ষা দেওয়া উচিত। স্থানীয় কর্মচারীরা যে ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করেছিলেন, তা ছিল অতি সামান্য। কলিকাতা থেকে পরিচয়-পত্র সঙ্গে নিয়েও সদিচ্ছা-প্রণোদিত যেসব ত্রাণ-কর্মী গেছলেন, তাঁদের ভারত-রক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার

করে জেলে পাঠান হয়েছিল। ঐ কর্মচারীদের ও-অঞ্চল থেকে বদলি করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি—কেন না তাতে নাকি, সরকারি মর্যাদায় আঘাত লাগবে। অন্যান্য প্রদেশের গবর্নমেণ্ট এর চেয়ে অনেক কম গুরুতর ব্যাপারে তদন্তের ব্যবস্থা করেন ; আমাদের পক্ষে তদন্ত করারও সুযোগ নেই—সে ক্ষেত্রেও মর্যাদায় আঘাত লাগবে। বাংলার জনগণের সম্মুখে একটিমাত্র পন্থা—সে হচ্ছে আইন ও শৃঙ্খলার ধারকদের হাত থেকে নিঃশব্দে যন্ত্রণা ভোগ করে যাওয়া আর প্রতি-শোধের জন্য—সে সুযোগ একদিন আসবেই—অপেক্ষা করা।

আমাদের বলা হয়েছে, মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলে এখনও রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে। বিচ্ছিন্ন এক-আধটা ক্ষেত্রে আন্দোলন থাকলেও থাকতে পারে—কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি নিশ্চিত বলতে পারি, মেদিনীপুরের অধিকাংশ লোক—কংগ্রেসের সমর্থকরা পর্যন্ত—অবিলম্বে শান্তি ফিরে পেতে চান। মেদিনীপুর জেলের ভিতরে এবং বাইরে অনেকের সঙ্গে আলাপ করে আমি বুঝেছি, সরকারি কর্মচারীরা যদি একটু কৌশল ও সহানুভূতির সঙ্গে পরিস্থিতি-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন, তবে ধ্বংসাত্মক কার্য পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে ; ত্রাণকার্যের ব্যাপারে মেদিনীপুরের প্রতিটি লোক গবর্নমেণ্টের সহযোগিতা করবে। এক পক্ষে কয়েকজন স্থানীয় কর্মচারীর ঔদাসীন্য ও দীর্ঘসূত্রতা এবং অপর পক্ষে কলিকাতার

আইন-শৃঙ্খলা বিভাগের কতিপয় প্রতিনিধির অদ্ভুত বাধাদান-প্রবৃত্তির মধ্যে পড়ে কি ভাবে এক মাসের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছে, তা ভাবতে গেলে মন বিষাক্ত হয়ে ওঠে। ওদিকে হাজার হাজার নরনারী খাদ্য আশ্রয় ঔষধ কাপড়চোপড় এবং পানীয় জলের অভাবে নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছে। অত্যাচার এবং ধীরগতি ত্রাণকার্যের এই যে বর্তমান নীতি—এ অতি নিষ্ঠুর ও মারাত্মক। ঐ জেলার কয়েকজন কর্মচারী বদলি না হওয়া পর্যন্ত এ জাতীয় কাজ বন্ধ হবে না কিংবা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ারও উন্নতি হবে না। মন্ত্রীরা অনুভব করেন, আইন ও শৃঙ্খলার যথার্থ পরিরক্ষণের জন্য এবং নির্যাতিত মানবতার পরিত্রাণের জন্য অবিলম্বে এই ব্যবস্থাই অবলম্বিত হওয়া উচিত। কিন্তু এই নীতি কার্যে পরিণত করার শক্তি মন্ত্রীদের নেই; আপনি এ সম্পর্কেও আমাদের উপদেশ গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়েছেন। বন্যা ও সাইক্লোনের ফলে অভূতপূর্ব ধ্বংস সংঘটিত হয়েছে, অন্তত ত্রিশ হাজার নরনারীর মৃত্যু ঘটেছে, গৃহপালিত পশু এবং ধন-সম্পত্তির বিপুল ক্ষতি হয়েছে। বৃটিশ সৈন্যরা শত্রু-বিমানের দ্বারা বিচূর্ণিত বিনষ্ট অঞ্চলের সঙ্গে ভয়াবহ ধ্বংসলীলায় বিধ্বস্ত এই অঞ্চলের তুলনা করেছে। বড়লাটের মতো প্রাদেশিক গবর্নর হিসাবে আপনিও কি এর জন্য অন্তত একটা সাধারণ সহানুভূতির বাণী প্রচার করতে পারতেন না? মেদিনীপুরের ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হোক, উভয় পক্ষেরই সঠিক বিবরণ প্রকাশ হতে

দেওয়া হোক। এতে সম্মত হবার মতো সাহস কি আপনার আছে ?

গবর্নমেণ্ট কর্তৃক যে ভাবে সমগ্র প্রদেশের ঘাড়ে পাইকারি জরিমানা চাপানো হয়েছে, তার সুতীব্র নিন্দা হওয়া বাঞ্ছনীয়। দোষের বিচার-বিবেচনা না করে কেবলমাত্র হিন্দুদের উপর পাইকারি জরিমানা চাপানোর পরিকল্পনা নিখিল ভারতবর্ষ জুড়েই চলেছে। প্রাচীনকালে ঔরংজেব যে জিজিয়া-করের জন্য অখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, পাইকারি জরিমানার নামে বৃটিশরা তারই পুনঃপ্রবর্তন করেছে। বাংলার প্রধানমন্ত্রী পাইকারি জরিমানা চাপানোর বিরুদ্ধে ছিলেন; ন্যায়ের দিক থেকে সুনিশ্চিত কতকগুলো নীতি নির্ধারণের জন্য তিনি বারবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। আপনি প্রধানমন্ত্রীর এ সিদ্ধান্তেও হস্তক্ষেপ করেছেন; তাঁর নির্দেশ কার্যে পরিণত হবার পথে বাধা দিয়েছেন। সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ বিচার না করে কিংবা সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদের অপরাধ বিবেচনা না করেই পাইকারি জরিমানার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। আমি জানি, অন্তত একটি ক্ষেত্রে কালেক্টরের সঙ্গে পর্যন্ত পরামর্শ করা হয় নি, আর অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে জরিমানা চাপানোর জন্য গবর্নমেণ্টই স্থানীয় কর্মচারীদের ডেকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই জাতীয় কয়েকটি ব্যাপারের দলিল-দস্তাবেজ আমি সযত্নে পরীক্ষা করে পাইকারি জরিমানার প্রাচুর্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। যে সব তথ্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত

গৃহীত হয়েছে, আমি আপনাকে সে সব যে-কোন নিরপেক্ষ বিচারকের সামনে উপস্থাপিত করতে আহ্বান জানাচ্ছি। বিচারক নিঃসন্দেহ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রায় দেবেন যে, অর্ডিনান্সের ব্যবস্থা অনুসারে পাইকারি জরিমানা সংগ্রহ করা যায় না, কিংবা যে পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়েছে তা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়, অথবা যে টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে তা ক্ষতির আনুপাতিক নয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীকে কিছু না জানিয়েই জরিমানা চাপানো হয়েছে। অতি-সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাব করেছিলেন, পক্ষ কালের জন্য জরিমানা আদায় বন্ধ রাখা হোক এবং মন্ত্রিমণ্ডলের একটি অধিবেশনে সমগ্র নীতি বিবেচনা করা হোক। আমাদের সকলের পক্ষ থেকে এই অনুরোধের যে উত্তর আপনি দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে ইতিপূর্বেই আপনি যে ঐতিহ্য স্থাপন করেছেন তার পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। মন্ত্রিমণ্ডলের অধিবেশন সম্পর্কে আপনার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু আপনি অশোভন অযৌক্তিকতা ও মন্ত্রীদের প্রতি চরম অসৌজন্য দেখিয়ে আগে থেকেই সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আপনার ব্যক্তিগত বিচার অনুসারেই অবিলম্বে আপনি পাইকারি জরিমানা আদায়ের নির্দেশ দেবেন।

জনসাধারণের অধিকার ও স্বাধীনতা-ঘটিত সকল প্রশ্নে কিংবা জাতি-বৈরিতা প্রকাশ পেতে পারে এ রকম ক্ষেত্রে আপনি যে ভাবে এই প্রদেশের জনগণের প্রকৃত স্বার্থের প্রতি

উদাসীন্য দেখিয়ে কাজ করেছেন—তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। সহানুভূতি, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সদিচ্ছা-প্রণোদিত শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তন করলে বর্তমানের মতো গুরুতর সঙ্কটেরও অবসান ঘটানো যেত। উচ্চ পদ্ধতির শাসননৈপুণ্য যাদের নেই, ভারতীয় মন ও অবস্থার সঙ্গে যারা পরিচয়বিহীন, আমলাতন্ত্রের দ্বারা অন্ধভাবে যারা পরিচালিত হয়—যুদ্ধের সময় এসব লোকের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করে। আপনি ও অন্যেরা কি করেছিলেন এবং কি করেন নি, যদি কখনও তার হিসাব-নিকাশ নেওয়া হয়—তখন দেখা যাবে, পরম সঙ্কটের মুহূর্তে আপনারা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিরাট প্রদেশের আদৌ সেবা করতে পারেন নি—অথচ ঠিক ভাবে চেষ্টা করলে বাংলার জনগণকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তোলা যেত এবং আসন্ন শত্রু-আক্রমণ থেকে দেশরক্ষার জন্য তারা যে কোন স্বার্থত্যাগ ও কষ্টস্বীকারে সম্মত হত। আপনি এবং অন্যেরা যা করেছেন তাতে শত্রুরই সাহায্য হয়েছে—যে শত্রুর আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। যাই ঘটুক না কেন, আমরা এই দেশের জনগণই যন্ত্রণা ভোগ করব—একদিকে আমাদের তথাকথিত রক্ষকদের হাতে, অপরদিকে প্রত্যাসন্ন ধ্বংসকারী শত্রুদের হাতে। আমাদের কাছ থেকে সামরিক সমস্ত ব্যাপার সুগোপনে লুকিয়ে রাখা হয়; তবু আমরা এখনও আশা রাখি, বাংলা ও ভারতকে সাফল্যের সঙ্গে রক্ষা করা হবেই।

কিন্তু যদি শোচনীয় কিছু ঘটে, তবে আপনারা—যাঁরা এখন বিশেষ দায়িত্বের ভারে নিজেদের অভিভূত বলে ভাবছেন, তাঁরা অনুরূপ অবস্থায় তাঁদের ব্রহ্মস্থিত বন্ধুদের মতোই এ দেশ থেকে দ্রুত সরে পড়বেন—আর মারা পড়ব আমরা নিরস্ত্র, সামরিক দিক দিয়ে অপ্রস্তুত ও শক্তিহীন—একদিকে আপনাদের বিদায়কালীন বুলেট ও বঞ্চনানীতির মর্মান্তিক দুর্দৈব এবং অপরদিকে অভিযানকারী শত্রুসেনার অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে। যদি আপনাদের মধ্যে সদিচ্ছা ও রাজনীতিবোধ থাকত, তবে অধিকাংশ ভারতবাসীই সানন্দে সাড়া দিত। তখন অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত স্বাধীন-ভারতবর্ষ ও মিত্রশক্তিপুঞ্জ প্রাকার-সদৃশ হয়ে দাঁড়াতে পারত।

বাংলা দেশের এই সঙ্কট-মুহূর্তে সরকারি কাজকর্মের ফলে আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এমন ভাবে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে—এতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি অকপটে অনুভব করি, যত দিন সাধারণ সর্বভারতীয় নীতি বর্তমানের মতো থাকবে এবং পরম অনিষ্টকর এই নীতি অনুসারে আপনি বাংলাদেশ শাসন করবেন, ততদিন স্বপদে অধিষ্ঠিত থেকে আমি দেশবাসীর কিংবা আপনার কোন কাজেই লাগতে পারব না।

আমার পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হলেই আমি এই চিঠি এবং গত মার্চ ও জুলাই মাসে আপনাকে লেখা চিঠি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেব। আপনি আমার জুলাই মাসের চিঠির যে উত্তর দিয়েছিলেন তা প্রকাশ করতে পারি কি? ১২ই

আগস্ট বড়লাটের কাছে প্রেরিত আমার চিঠিও এই সঙ্গে প্রকাশ করতে চাই। আমার চিঠির যে উত্তর তিনি দিয়েছিলেন, সেটা প্রকাশ করতে পারি কিনা—দয়া করে আপনি খোঁজ নিয়ে জানাবেন। এই সব চিঠিতে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, ভারত এবং ভারতের বাইরে জনসাধারণের কাছে তার বিশেষরূপ গুরুত্ব আছে—বিশেষ করে আমাদের দেশের ইতিহাসের এই সঙ্কট-ক্ষণে।

বশম্বদ

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মাননীয় স্যার জন হার্বার্ট

বাংলার গবর্নর

(৫)

১৬ নবেম্বর, ১৯৪২

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

আজ গবর্নরকে এক দীর্ঘ পত্র লিখেছি ; তার একটা নকল এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। যেসব ঘটনার ফলে (আপনার বা আমার যার উপর কোন হাত ছিল না) আমি পদত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি তা এর থেকে বুঝতে পারবেন।

গবর্নরের নামে নিয়মমাফিক একটি পদত্যাগ-পত্র এই সঙ্গে পাঠানো হল। এটা দয়া করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

ভবিষ্যতে যাই ঘটুক না কেন, আমি এ বিশ্বাস রাখি যে বাংলার জনগণের অধিকার-রক্ষার জন্য এবং সাম্প্রদায়িক সুস্থ আবহাওয়া বজায় রাখবার জন্য আপনি ও আমি একত্রে কাজ করতে পারব।

গত এক বৎসর আপনি আমার উপর প্রভূত বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। তার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

বশম্বদ

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মাননীয় মিঃ এ. কে. ফজলুল হক
বাংলার প্রধানমন্ত্রী

(৬)

১৬ নবেম্বর, ১৯৪২

প্রিয় স্যার জন,

এই পত্রের দ্বারা আমি মন্ত্রীপদ ত্যাগ করছি।

কেন আমি এই পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হলাম, বিস্তৃতভাবে তা বর্ণনা করে আমি আজ আপনাকে অন্য একখানি চিঠি লিখেছি। প্রধানমন্ত্রীর মারফৎ আপনাকে এই চিঠি পাঠানো হল।

বশম্বদ

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মাননীয় স্যার জন হার্বার্ট,
বাংলার গবর্নর

বিবৃতি ও আলোচনা

কেন পদত্যাগ করেছিলাম

[বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ১৯৪৩-এর ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখের বিবৃতি]

মাননীয় ডেপুটি-স্পীকার মহোদয়, যে সব কারণে আমি মন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলাম সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা-পরিষদের প্রারম্ভ দিনে আমি একটি বিবৃতি দিতে চাই। এই বিবৃতি দেওয়ার বিশেষ আবশ্যক এই জন্য যে আমার প্রতি ব্যবস্থা-পরিষদের অনাস্থা কিংবা আমার দলের অনাস্থা আমার এই পদত্যাগের কারণ নয়। প্রধান-মন্ত্রী কিংবা অন্য কোন মন্ত্রীর সঙ্গে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতভেদের দরুনও আমি পদত্যাগ করি নি। পরিষদের সদস্যরা জানেন, আমার পদত্যাগ করবার প্রথম কারণ—আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে, বৃটিশ-গবর্নমেণ্ট এবং এ দেশের গবর্নমেণ্টের অনুসৃত নীতি হচ্ছে, ভারতীয়দের পূর্ণতর রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা, জনগণের প্রকৃত স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাল শাসনব্যবস্থা ব্যাহত করা এবং শত্রুর অভিযানের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ-শক্তি দুর্বল করা। গবর্নরকে লেখা পদত্যাগ-পত্রে নিখিল-ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি-ঘটিত যে সব প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি আলোচনা করেছি, সে সবের পুনরাবৃত্তি করা আমার অভিপ্রায় নয়। অন্যান্য কয়েকটি দলিল সহ সেই চিঠি * এই প্রদেশের

A Phase of the Indian Struggle

গবর্নমেণ্টের হিটলারি ঐতিহ্য অনুসারে আজ বাজেয়াপ্ত হয়ে আছে। তথ্য এবং সংখ্যা দিয়ে স্বৈরাচারী কুশাসনের বিরুদ্ধে একজন মন্ত্রীর অভিযোগের প্রত্যুত্তর দেবার প্রয়োজন নেই—বরং স্বেচ্ছাচারী রীতিতে সে অভিযোগ চেপে রাখতে হবে—বৃটিশ কর্তৃপক্ষ আজ আমাদের সামনে এদেশের দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার এই ধারণাতীত চিত্র তুলে ধরেছেন।

ভারতে বর্তমান অচল অবস্থার জন্য আমি কর্তৃপক্ষকেই সুনিশ্চিতরূপে দায়ী বলে মনে করি। সমগ্রভাবে ভারতীয় জনসাধারণের কোন বিদেশি অভিযানকারীর প্রতি সহানুভূতি থাকতে পারে না। এর কারণ সহজ ও প্রত্যক্ষ। আমরা প্রভু বদল করতে চাই না। যে রাজনৈতিক পদমর্যাদা আমাদের দেশের জন্মস্বত্ব, তা যথাসম্ভব দ্রুত যাতে পাওয়া যেতে পারে—আমরা তাই-ই দেখতে চাই। নূতন কোন বিদেশি শক্তির অধীন হবার ইচ্ছা থাকলে আমাদের পক্ষে বৃটিশ কর্তৃত্ব হতে মুক্তি চাইবার কোন অর্থ হয় না। ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার উপরে বর্তমানে যে সব প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তির প্রভুত্ব, তাদের পক্ষে অচল অবস্থাই বাঞ্ছনীয় ; আর এটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে ভারতে বৃটিশ-গবর্নমেণ্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা নেই। ভারতীয় জনসাধারণকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পদতলে রাখার জন্য অজুহাতের পর অজুহাত সৃষ্টি করা হয়। বৃটিশ মুখপাত্ররা যাই বলুন, ভারতের প্রতি মনোভাব সম্পর্কে তাঁদের গবর্নমেণ্টের মুখোস খুলে পড়েছে। নিজ-

স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে দুর্বলতর রাজ্যসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে তাদের উপর প্রভুত্ব করবার জন্য অক্ষশক্তিবর্গের যে লোভ, প্রকৃত পক্ষে তার সঙ্গে এ লোভের কোন বিভিন্নতা আমরা দেখতে পাই না। গত আগস্ট মাস থেকে আমরা ভারতে অত্যাচারের রাজত্ব দেখছি; শুধু তথাকথিত নাশকতামূলক গোপন আন্দোলনের বিরুদ্ধেই তা প্রযুক্ত হয় নি—প্রযুক্ত হয়েছে ভারতীয়রা যে বিদেশি শাসনকে ঘৃণা করে, সেই শাসনের অবসানকল্পে ভারতীয় ইচ্ছা-শক্তি সংহত করার জন্য যা-কিছু জাতীয় আন্দোলন আছে, তারই বিরুদ্ধে। আমাদের বৃটিশ-বন্ধুরা উচ্চতর নৈতিক মঞ্চ থেকে সময় সময় হিটলারকে গালমন্দ করেন বলেই আমরা প্রভুদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সমস্ত নির্যাতিত দেশের ইতিহাসে দেখা যায় যে অত্যাচারীর অত্যাচার যত বাড়ে, অত্যাচারিতের ঐক্যবদ্ধ হবার এবং নিজ অধিকারের জন্য সংগ্রাম করার আগ্রহও তত গভীর হয়। সশস্ত্র অত্যাচারীর হস্তে নিরস্ত্র জনগণের লাঞ্ছনা জন-শক্তি উন্নীত করে; আর অত্যাচারী বিশ্ব-জনমতের বিচারালয়ে ঘৃণ্য বলে বিবেচিত হয়। লাঞ্ছিতদের কিছুকালের জন্য তারা ভীতিচকিত করে রাখতে পারে। কিন্তু ঘৃণা এবং তিক্ততা ক্রমশ গভীরতর হয়; 'শক্তিই অধিকার' এই নিয়মের যারা সমর্থক, তারা ভাবতে না পারলেও, অত্যাচারের ঘোরতর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। তার ফলে যে শিথিল ও কম্পমান ভিত্তির উপর অত্যাচারী গবর্নমেণ্টের অস্তিত্ব, পরিণামে তা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে।

শুধু এই সর্বভারতীয় নীতি এবং বাংলায় তার প্রতিক্রিয়ার দরুনই আমি পদত্যাগ করি নি—অন্যান্য অনেক ঘটনা ছিল, যার ফলে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে আমার পক্ষে মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এই প্রদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম হিন্দু-মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সুবৃহৎ অংশের প্রতিনিধিরা প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রকে কার্যকরী করার জন্য একত্রিত হয়েছিলেন। বিরোধী-দল যে আজ বাংলার মুসলমান জনমতের একটা বড় অংশের প্রতিনিধি—সে কথা আমি অস্বীকার করি না। বাংলার ইতিহাসের এই সঙ্কট-মুহূর্তে জনগণের অধিকার-রক্ষার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করার জন্য সাধারণ কর্মতালিকা গ্রহণ করে ব্যবস্থা-পরিষদের সকল ভারতীয় দলের মিলন সম্ভব হলে ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে তার চেয়ে অধিকতর সুখের কারণ আর কিছু থাকত না। যাই হোক, মৌলবি ফজলুল হকের নেতৃত্বে আমরা যেটুকু মিলন ঘটিয়েছিলাম, এই প্রদেশের স্থায়ী রাজকর্মচারীদের একাংশের—এমন কি প্রদেশের শাসনকর্তার পক্ষেও—তা অত্যন্ত তিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্বের দরবারে হিন্দু-মুসলমানের নিরবচ্ছিন্ন বিরোধবার্তা প্রচার করেই বৃটিশ-শাসন বেঁচে আছে। বস্তুত এই দু'টি সম্প্রদায়ের আংশিক মিলনের ফলে যে-আমলাতন্ত্রের হাতে প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা রয়েছে, তাদের সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটেছিল।

যে শাসনতন্ত্র অনুসারে এ প্রদেশের শাসনকার্য চলে,

আমি সংক্ষেপে সেই শাসনতন্ত্রের সম্পর্কে অপরিহার্য কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জাঁকজমকপূর্ণ রূপ দেখিয়ে বিদেশি জনমতকে শান্ত করার প্রয়োজন হলে তখনই মিঃ আমেরির শো-বয় হিসাবে ভারতীয় মন্ত্রীদের তুলে ধরা হয়। বিশ্ববাসীদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, কোটি কোটি ভারতীয়ের ভাগ্য নির্ভর করছে ব্যবস্থা-পরিষদের কাছে দায়িত্বশীল ভারতীয় মন্ত্রিমণ্ডলের হাতে। প্রকৃত সত্য কিন্তু এই যে, মন্ত্রীদের বিরাট দায়িত্ব থাকলেও এবং ব্যবস্থা-পরিষদের কাছে নিজেদের এবং দায়িত্বজ্ঞানশূন্য আমলাতন্ত্রের ব্যবহার ও কার্য-কলাপের জন্য জবাবদিহি করতে হলেও, তাঁদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা অত্যন্ত কমই থাকে; প্রকৃত ক্ষমতার মালিক হচ্ছেন প্রদেশের স্বৈরাচারী গবর্নর। আর গবর্নরের অঙ্গুলি-নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে আছে সহানুভূতি ও দূরদৃষ্টি-বিহীন ক্ষুদ্র একদল কর্মচারী—যারা প্রদেশের জনগণের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ। ভারত শাসনতন্ত্রের যে সব উল্লেখযোগ্য ধারা অনুসারে বিবেক ও বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করার অধিকার গবর্নরের আছে, সে সব ছাড়াও ৬২-ধারায় তাঁকে অধিকতর বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গবর্নর প্রতিক্রিয়াশীল হলে তিনি তাঁর মনোনীত রাজকর্মচারীদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় এই সব ধারা এমনভাবে প্রয়োগ করতে পারেন যার ফলে জনগণের স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে। যে গবর্নরের শাসনতান্ত্রিক অধিনায়করূপে

কাজ করার দক্ষতা সততা ও ইচ্ছা আছে, যিনি শাসনতন্ত্রের ভিত্তি বিস্তৃত করে সুস্থ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে সর্বদা প্রস্তুত, যিনি স্বেচ্ছাচারী একনায়ক কিংবা প্রতি কাজে হস্তক্ষেপ-কারী নন—এমন প্রাদেশিক গবর্নর যে আমরা পাবই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। গবর্নর ও তাঁর নির্বাচিত সুখী-পরিবার রাজকর্মচারীদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রদেশের জন-সাধারণের কোন রক্ষা-ব্যবস্থা নেই। একথা সবাই জানে যে, গুণ কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির উদারতার ভিত্তিতে ভারতের প্রাদেশিক গবর্নর নির্বাচিত করা হয় না—প্রায়ই তাঁদের নির্বাচিত করা হয় ব্যক্তিগত কারণে এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা থাকার দরুন। কাজেই শাসন-ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত গুণের বিচারে যে লোকটির সওদাগরি অফিসে হেড-ক্লার্ক হবারও যোগ্যতা নেই কিংবা ষড়যন্ত্রকুশলতা ও একের বিরুদ্ধে অপরকে উস্কিয়ে দেওয়ার দক্ষতার জন্য যে লোকটি বড় জোর ইলিসিয়াম রোর একটি সাধারণ চেয়ারের শোভা-বর্ধন করতে পারে—হঠাৎ দেখা গেল ভারতের একটি প্রদেশের গবর্নর হয়ে সে সর্বোচ্চ গদিতে সমাসীন হয়েছে। সাধারণের সমা-লোচনার উর্ধ্বে বসে, নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কথা ভুলে গিয়ে সে পর্দার আড়ালে এমন সব কাজ করতে সমুৎসাহিত হয়, যার ফলে প্রদেশের শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে সে রীতিমত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।

আমার মন্ত্রিত্বকালে সবিস্ময়ে দেখেছি যে জনগণের

অধিকার ও স্বাধীনতা-সম্পর্কিত বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীদের প্রদত্ত উপদেশ পরে নূতন উপদেশের আলোকে অবশ্যম্ভাবী রূপে পুনর্বিবেচিত হয়। নূতন উপদেশ যাঁরা দেন তাঁরা সরকারি কর্মচারীদের অধিকতর বিশ্বাসভাজন এবং সর্ববিষয়ক দক্ষতার জন্য তাঁরা প্রায় ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনীয়। শ্রেণী হিসাবে সরকারি কর্মচারী মাত্রেই যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা রাখতে পারেন না, এমন অভিযোগ আমি করছি না। আমি বৃটিশ এবং ভারতীয় এমন সব রাজকর্মচারীর কথা জানি—এ প্রদেশের পক্ষে যাঁদের কাজ মহামূল্যবান। আমার অভিযোগের লক্ষ্য, ক্ষুদ্র একদল রাজকর্মচারী যাঁরা চতুর্থ স্টেট বা প্রকৃত স্টেট গঠন করে বসে আছেন। তাঁরা প্রদেশের শাসন-কার্যের উপর অকল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। ভারত-রক্ষা নিয়মাবলীর ভাষায়—তাঁরাই ভয়ঙ্কর লোক। আমি প্রাদেশিক শাসনের সব কিছু খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করতে পারি না। এর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য, এখানে গভর্নমেণ্টের মধ্যে আর এক গভর্নমেণ্টের প্রহসনমূলক অস্তিত্ব আছে। এ ব্যাপার শুধু আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগেই নয়—অন্যান্য বিভাগেও আছে। হস্তক্ষেপ-ব্যাপারের মূলনীতি ছিল, দেশের জনগণকে কোনক্রমে বিশ্বাস করা চলবে না; যে ক্ষেত্রে সম্ভব সেই ক্ষেত্রেই ক্ষমতা রাখতে হবে নির্বাচিত বৃটিশ রাজকর্মচারীদের হাতে, যাঁরা গবর্নর এবং তাঁর অনুগত কর্মচারীদলের একান্ত বিশ্বাসভাজন।

রাজবন্দীদের মুক্তিদান বিষয়ে মন্ত্রীরা এমন এক নীতি অনুসরণের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, নীতি বর্তমান যুদ্ধের জরুরি অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েও অন্য শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রদেশের রক্ষাকার্যে সকল দলের ঐক্যমত সংগঠনে সাহায্য করত। কিন্তু স্থায়ী রাজকর্মচারীদের দিক থেকে অবিচ্ছিন্ন বাধা আসত। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার যিনি প্রধান কর্তা তাদের পিছনে তাঁরও সমর্থন ছিল বলে মন্ত্রীদের পক্ষে ঐ কর্মচারীদের সরানো সম্ভব ছিল না। জাতি সম্প্রদায় ও রাজনীতি নির্বিশেষে জনসেনা-সংগঠনের প্রাথমিক চেষ্টা হিসাবে হোম-গার্ডের এক পুনর্বিবেচিত পরিকল্পনা মন্ত্রিমণ্ডল অনুমোদন করেছিলেন। গভর্নর কিন্তু সে পরিকল্পনা এক-কথায় নাকচ করে দিয়েছিলেন—তার কারণ, আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগের বীরপুঙ্গবরা নিজেদের মাতৃভূমি রক্ষা কিংবা আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ বাঙালিদের বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলেন না। খাদ্য এবং নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ সম্বন্ধে বর্তমান পরিস্থিতি জটিল অবস্থা ধারণ করেছে। কিন্তু এখানেও জনসাধারণের দুঃখত্রাণের জন্য সমন্বয়-সাধনের অভাব ও ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়নের অসামর্থ্যের জন্য মূলত দায়ী গভর্নরের হস্তক্ষেপ এবং তাঁর অনুগৃহীত কর্মচারীদের নীতি। ঐ কর্মচারীদের কাজ পছন্দ হোক আর না-ই হোক, মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষে তাঁদের স্বীকার না করে নিয়ে উপায় নেই।

কংগ্রেসের আগস্ট মাসের সিদ্ধান্তের দরুন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা শুরু হবার আগে থেকেই ভারত গবর্নমেণ্ট আন্দোলন-দমনের নীতি স্থির করে দিয়েছিলেন। আর এই হতভাগ্য দেশে যে দায়িত্বশীল গবর্নমেণ্ট কার্য-রত, এমনই তার স্বরূপ যে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর পুনঃ পুনঃ দাবি স্বত্ত্বেও মন্ত্রিমণ্ডলের সামনে ঐ নীতি উপস্থাপিত হয় নি। জন-কয়েক রাজকর্মচারী কিন্তু ঐ দলিল দেখতে পেয়েছিলেন; তাঁরা পরিকল্পনা ও প্রস্তাব নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। আর মন্ত্রীরা সেটা দেখতে পেয়েছিলেন ৯ই আগস্ট ভারত গবর্নমেণ্ট কর্তৃক ঐ নীতি কাজে পরিণত হবার পর। একজন বাঙালি আই. সি. এস.-এর নিয়োগ ব্যাপারে মন্ত্রীর অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও গবর্নরের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁর দাবি উপেক্ষিত হয়েছিল। অজুহাত দেওয়া হয়েছিল, ভারত-শাসনতন্ত্র অনুসারে গবর্নরই নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী সমস্ত নিয়োগ এবং বদলি করার কর্তা। এখানে প্রশ্ন করা চলে যে নির্বাচিত অফিসারদের স্বার্থ-সংরক্ষণ কিংবা গবর্নরের নিজ সম্প্রদায়ের সদস্যদের স্বার্থ-রক্ষার বেলাতেই কি শুধু বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করা অভিপ্রেত? একজন বৃটিশ-রাজকর্মচারি এমন কথা লেখারও দুঃসাহস দেখিয়েছিল যে পূর্ববঙ্গের হতভাগ্য স্থানান্তরিতদের যে পাওনার হার আছে, তা তাদের প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশি এবং "একজন সাম্রাজ্যিক অফিসার" হিসাবেই (একথা আমার নয়, তাঁর—

এর পরে কে বলতে সাহস পাবে যে ভারতের মাটিতে কখনও সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু ঘটবে) সে প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টের আদেশ-পালনে অস্বীকৃত হয়েছে। এই অফিসারটি এখনও ক্ষমতার অধিকারী এবং দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত।

অত্যাচারমূলক ঘটনা অনেক ঘটেছে। আর আমি যে শাসক ছোট দলটির উল্লেখ করেছি, তাঁরা অত্যাচারের অভিযোগ সম্বন্ধীয় তদন্তের প্রতিরোধে অত্যন্ত একগুঁয়েমি দেখিয়েছেন। অপেক্ষাকৃত ছোট পদের অধিকারী একজন বাঙালি অফিসার পূর্ববঙ্গের কোন অঞ্চলে মিলিটারি জুলুম সম্বন্ধে অভিযোগ করার সাহস দেখিয়েছিলেন। তাঁর উপর এই ছোট দলটির আক্রোশ গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে বদলি করার আদেশ দেওয়া হল। উচ্চতর পদাধিকারী রাজকর্মচারীরা জনগণের উপর যখন অত্যাচার চালাতেন, তাঁদের স্থানান্তরে প্রেরণ ও তাঁদের কাজকর্ম সম্বন্ধে তদন্তের দাবি জানালে তখন মর্যাদার প্রসঙ্গ এসে পড়ত; সত্য ও ন্যায়কে ভ্রান্ত মর্যাদার বেদীমূলে বলি দেওয়া হত। মন্ত্রীদের না জানিয়ে গবর্নমেণ্ট-হাউস এবং সেক্রেটারিয়েটের মধ্যে ঘনিষ্ঠ শলা-পরামর্শ চালানো নিয়মিত ব্যাপার হয়ে উঠেছিল,এবং ফাইলের উপরে প্রায়ই জনসাধারণের দাবি ব্যর্থ করার জন্য সযত্নে প্রস্তুত পরিকল্পনার সাক্ষ্য পাওয়া যেত।

পাইকারি জরিমানা প্রবর্তনের ইতিহাস হচ্ছে, ইচ্ছে করে ন্যায় ও সুবিচার লঙ্ঘন করবার আর একটি বিচিত্র অধ্যায়।

এ বিষয়েও আমার মন্তব্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিবৃত করেছি। পাইকারি জরিমানা করে পাইকারি ভাবে শাস্তি দেবার জন্য হিন্দুদেরই বেছে নেওয়া হয়েছিল। আমি একবারও বলতে চাই না যে, সমগ্রভাবে মুসলমানদের এর সঙ্গে জুড়ে নিলে প্রতিকার হবে। আমার দাবি, অর্ডিন্যান্সের বিধি অনুসারে যারা দোষী প্রমাণিত হবে শুধু তাদেরই জরিমানা করা উচিত; সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে জরিমানা করা উচিত নয়। সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুদের নির্যাতিত করা যদি গবর্নমেণ্টের নীতি না হয়, তবে নির্দোষ মুসলমানদের যেমন বাদ দেওয়া উচিত, নির্দোষ হিন্দুদেরও তেমনই বাদ দেওয়া উচিত। মন্ত্রী হিসাবে আমরা চেয়েছিলাম, গোটা নীতিটাই মন্ত্রিমণ্ডলের সভায় পুনর্বিবেচিত হোক। ন্যায়সঙ্গত ক্ষেত্রে অর্ডিন্যান্সের সঠিক প্রয়োগই আমরা দাবি করেছিলাম। ব্যবস্থা-পরিষদ এ কথা জেনে হয়তো বিস্মিত হবেন যে বিষয়টি মন্ত্রিমণ্ডল কর্তৃক বিবেচিত হোক—এ বিষয়ে গবর্নর ইচ্ছুক থাকলেও তিনি মন্ত্রীদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে মন্ত্রিমণ্ডলের সিদ্ধান্ত যা-ই হোক না কেন, ইতিপূর্বে যে জরিমানা করা হয়েছে তা সংগ্রহ করতে হবেই এবং ইতিপূর্বে যে নীতি অবলম্বিত হয়েছে তা-ও কার্য্যকরী হবে। প্রয়োজন হলে তিনি তাঁর নিজের বিশেষ দায়িত্বে এই সম্পর্কে আদেশ দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

ব্যবস্থা-পরিষদের নিশ্চয়ই মনে পড়ে, একটি সাম্প্রতিক

আলোচনার সময় ব্যবস্থা-পরিষদের সকল দলের ভারতীয় সদস্যরা সেনাবাহিনীতে প্রবেশের সর্তগুলো শিথিল করার জন্য গবর্নমেন্টকে চাপ দিয়েছিলেন এবং আমাদের গৃহ-রক্ষার পবিত্র কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ একটি জাতীয়বাহিনী সংগঠনের ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। মন্ত্রিমণ্ডলও এই ধরণের জাতীয়বাহিনী গঠন সম্বন্ধে একমত ছিলেন। কিন্তু উচ্চতর মহল থেকে প্রতিনিয়ত বাধা আসছিল। যে সব অজুহাত দেখানো হয়েছিল তার মধ্যে ছিল অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের অভাব, শিক্ষকের অভাব, সময়ের অভাব প্রভৃতি। আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সশস্ত্র প্রতিরোধের কাজ অ-বাঙালিদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভাল ; শত্রু যদি কখন আমাদের দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তবে অসহযোগিতার দ্বারা বাধাদানের জন্য জনগণের মন তৈরি করাই আমাদের কাজ হওয়া উচিত। এই প্রদেশের বৃটিশ-প্রতিনিধিরা সহসা অহিংস নীতির প্রতি অতিমাত্রায় স্নেহশীল হয়ে উঠেছিলেন— এ কিন্তু প্রকৃত কারণ নয়। নিজের ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ড কখনই এ নীতি অনুকরণ করতে চাইত না। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালির প্রতি দৃঢ়বদ্ধ অবিশ্বাসই প্রদেশের মনুষ্যত্ব ধ্বংস করার জন্য এই সুচিন্তিত নীতির মূল কারণ।

শত্রুকে বঞ্চনা করার নীতি এবং সামরিক উদ্দেশ্যে বাধ্যতা-মূলকভাবে জনসাধারণকে স্থানান্তরে প্রেরণের নীতি বাংলায় হাজার হাজার দরিদ্র নরনারীর চরম কষ্টের কারণ হয়েছে।

মন্ত্রিমণ্ডল একমত হয়ে যে স্মারক-লিপি তৈরি করেছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল—শত্রুকে বঞ্চনা করার এই নীতি পরাজয়ী-মনোবৃত্তির ফল ; সামরিক প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এ সহজেই এড়ানো যেতে পারে। কিন্তু এই স্মারকলিপি ভারত-গবর্নমেণ্টের কাছেও প্রেরিত হয় নি। মন্ত্রীদের উপদেশে শেষ পর্যন্ত এই নীতির বিস্তৃত প্রয়োগ-ব্যাপারে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটলেও, এর ফলে বাংলার বহু অঞ্চলে অভূতপূর্ব সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছে ; তার কোন প্রতিকার করা যায় নি।

পরিশেষে, আমি মেদিনীপুরের কথা বলতে চাই। এই জেলার কোন কোন অঞ্চলে গুরুতর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল—একথা আমি মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হচ্ছি না। বিশৃঙ্খলা এবং শাসন-কর্তৃত্বের প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা দমনের জন্য যে কোন বৈধ-ব্যবস্থা অবলম্বনের কারণ বোঝা যায়। কিন্তু জনগণের একাংশ গবর্নমেণ্টকে চ্যালেঞ্জ করল—আর স্থানীয় রাজকর্মচারীরা অমনি সভ্য শাসন-ব্যবস্থার মূলনীতি ভঙ্গ করলেন, সংশ্লিষ্ট জনগণ অপরাধী কিনা বিচার না করেই অত্যাচারের নির্দয় অভিযান চালালেন—এইরূপ প্রকাশ। আমাদের কাছে বিভিন্ন বেসরকারি সূত্র থেকে যে সব সংবাদ এসে পৌঁছত, তার অনেক সংবাদে নাশকতামূলক আন্দোলনের কোনই সমর্থন থাকত না—সেই সব সংবাদের ভিতর থাকত নির্দোষ জনসাধারণকে গুলি করা, সম্পত্তি লুণ্ঠন

ও ধ্বংস করা, এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর এক সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করা, নারীর উপর অত্যাচার করা প্রভৃতি অভিযোগ। আমাদের হাতে আসত পুলিশ এবং মিলিটারির দ্বারা কিংবা তাদের নির্দেশক্রমে যে সব বাড়ি আক্রমণ করা ও পোড়ানো হয়েছিল তার তালিকা। ১৬ই অক্টোবর ভয়াবহ সাইক্লোনের দিনেই আমি স্বরাষ্ট্র-বিভাগের কয়েকজন উচ্চতম কর্মচারীর হাতে এই ধরনের একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছিলাম; আর যে সব বর্বর অত্যাচার সম্বন্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, যাতে তা অবিলম্বে বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছিলাম। সেই ১৬ই অক্টোবর তারিখেই এল প্রকৃতির ভয়াবহ আঘাত। এই প্রাকৃতিক দুর্দৈবে ধনপ্রাণের সুবিপুল ক্ষতি হয়েছিল। দুর্দৈব রাজকর্মচারী এবং স্থানীয় জনসাধারণের মন থেকে তিক্ততা ও ক্ষত ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে এবং মানুষের দুঃখ-নিবারণের জন্য তাঁরা অতঃপর এক কল্যাণ-সঙ্কল্পের মিলিত সূত্রে আবদ্ধ হবেন—একথা ভাবা স্বাভাবিক। কিন্তু এই অবস্থার ভিতরেও আমি উচ্চতম থেকে নিম্নতম পদাধিকারী অনেক রাজকর্মচারীর মধ্যে যে হৃদয়হীনতা দেখেছিলাম তা সভ্য শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসে তুলনাবিহীন। নাৎসী-অত্যাচার আমাদের ঘৃণা করতে শেখানো হয়। বৃটিশ-প্রচারকরা অক্ষশক্তির অধিকৃত দেশে অত্যাচারের যে বিবরণ প্রচার করে, তার সঙ্গে বৃটিশ শাসনাধীন বাংলা ও ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত গত পাঁচমাসের ভয়াবহ অত্যাচারের কি অপূর্ব সাদৃশ্য দেখা যায়!

ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের আমি এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় অনুধাবন করতে অনুরোধ করি। এটা ঠিক যে মেদিনীপুরে কয়েকজন মুসলমান অফিসার কার্যরত আছেন। কিন্তু মুসলমান অফিসার বলেই তাঁদের বিরুদ্ধে আমার আক্রমণ নয়। প্রকৃতপক্ষে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে হিন্দু অফিসারের সংখ্যাই বেশি। বিশেষ করে যে সব বৃটিশ-অফিসার প্রধান কর্মকেন্দ্রে বসে আছেন, তাঁদের বিরোধিতা না হোক চরম ঔদাসীন্য থেকে বোঝা যায়, এদেশে বৃটিশ ঐতিহ্য কি নিচু স্তরে নেমে গেছে! জাতি সম্প্রদায় কিম্বা রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে অফিসার হিসাবেই তাঁদের বিরুদ্ধে আমার আক্রমণ।

মেদিনীপুর সম্পর্কে আমার প্রথম অভিযোগ হচ্ছে, ১৬ই অক্টোবর তারিখের ধ্বংসলীলার সংবাদ-প্রকাশে ইচ্ছাকৃত অযথা বিলম্ব। বহুক্ষেত্রে ভারত-রক্ষা আইনের বিধানাবলী অপপ্রযুক্ত হয়েছে; কিন্তু ভারতের আর কোথাও বোধ করি এর চেয়ে ঘৃণ্যতর প্রয়োগ হয় নি। রাজকর্মচারীদের সুখী-পরিবার চৌদ্দ দিন ধরে ভয়াবহ দুর্দিনের সংবাদ চেপে রেখেছিলেন। এমন কি সাহায্যের আবেদনও প্রকাশ করতে দেওয়া হয় নি। এর যে কারণ দেখানো হয়েছিল তা কোনক্রমেই সমর্থন-যোগ্য নয়। মূল্যবান সময় অন্যায় রূপে নষ্ট করা হয়েছিল; সুসমন্বিত ও সুসংবদ্ধ ত্রাণকার্যের অভাবে জনসাধারণ শোচনীয় ভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট নিজেকে

প্রয়োজনের অনুরূপ দক্ষ বলে প্রমাণ করতে পারেন নি। 'বিদ্রোহী' নামে অভিহিত জনগণের বিরুদ্ধে তাঁর আগে থেকেই আক্রোশ ছিল ; দায়িত্বশীল অফিসার হিসাবে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য তাঁর যা করা উচিত ছিল, তা তিনি করেন নি। তিনি কয়েকটি পথ পরিষ্কার করেছিলেন এবং সামান্য কিছু কিছু কাজ করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত মনোভাব আমরা জানতে পেরেছিলাম, যখন তিনি তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন, জনগণের রাজনৈতিক কুকার্যের কথা স্মরণ রেখে গবর্নমেণ্টের ত্রাণ-কার্য বন্ধ রাখাই শুধু নয়—অন্য কোন বেসরকারি আর্তত্রাণ-প্রতিষ্ঠানকেও ঐ অঞ্চলে ত্রাণকার্য পরিচালনার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। হৃদয়হীনতা এর চেয়ে আর কত শোচনীয় হতে পারে? গবর্নর নিজে সুদীর্ঘকাল নীরব থেকে অবশেষে ত্রাণকার্য পরিচালনার জন্য সকল সম্প্রদায়ের জনগণের সহযোগিতা আহ্বান করেছিলেন। আমরা যখনই এমন আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছি যাতে সমস্ত রাজনৈতিক বিতর্ক পিছনে ফেলে ত্রাণপ্রতিষ্ঠান সংগঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে জনগণ ঐক্য-বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে, তখন আমাদের কাজে পুনঃ পুনঃ বাধা দেওয়া হয়েছে। সাইক্লোনের প্রায় বারোদিন পরে আমি ও অপর দু'জন মন্ত্রী মেদিনীপুর গেছলাম। আমরা জনগণের যে দুঃখ-দুর্দশা দেখেছিলাম তা বর্ণনার অতীত। ত্রাণ-কর্ম তখন চলছিল নৈরাশ্যজনক বিশৃঙ্খল

অবস্থায়। জনসাধারণকে চলাফেরা ও কাজ করার সামান্যতম সুযোগও দেওয়া হচ্ছিল না। কারাগারের ভিতরে ও বাইরে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমরা এসব বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমি দেখেছি, এই ভয়ানক দুর্বিপাকের মধ্যে লোকের দুঃখ-নিবারণের জন্য একসঙ্গে কাজ করার প্রকৃত আগ্রহ ছিল তাঁদের সকলেরই। শুধু প্রয়োজন ছিল সরকার-পক্ষের বলিষ্ঠ কল্পনার। কলিকাতায় ফিরে আসবার পর আমরা সেক্রেটারিয়েটের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুখী গোষ্ঠীর সঙ্গে এ বিষয়ে দুইদিন ধরে আলোচনা করেছিলাম। এই সব তথাকথিত জনসাধারণের ভৃত্যদের বিরোধী এবং অবাস্তব মনোভাব দেখে আমি সেই সময় অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমরা সাহায্য-দানের যে নীতি অনুমোদন করেছিলাম, প্রধানমন্ত্রী তাতে সম্মত ছিলেন। কিন্তু আমরা বাধা পেলাম গবর্নরের হস্তক্ষেপে। বহুসংখ্যক রাজবন্দী এবং জেলের বাইরের বহু লোক সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত হতে পারল না। শুধু তাই নয়—গবর্নমেণ্ট দিনের বেলা ত্রাণকার্য এবং রাত্রে আক্রমণ-অত্যাচারের উন্মত্ত নীতি চালাতে লাগলেন। সাইক্লোনের আগে তো জনসাধারণের ঘর-বাড়ি পোড়ানো ও লুঠ করা অব্যাহত গতিতেই চলছিল; আমার আজ বলতে লজ্জা হচ্ছে, সাইক্লোনের পরে সরকারি নিষেধ থাকা সত্ত্বেও এই জেলার কোন কোন অঞ্চলে ঐ নীতি চালানো হয়েছিল। আমি নিজে এবিষয়ে অনুসন্ধান

করেছি ; সাইক্লোনের পূর্বে ও পরে যাদের বাড়ি আক্রমণ করা হয়েছিল, লুঠ করা হয়েছিল—তাদের নামের তালিকাও আমার কাছে আছে। কয়েকটি তালিকার নকল আমি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের হাতে দিয়েছি। আইন ও শৃঙ্খলার ধারক রূপে নিজেদের পরিচয় দিয়েও যারা এইরূপ অপরাধে অপরাধী, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে বলে আজও আমি খবর পাই নি। জনগণ আমাদের সম্মুখে এবং স্থানীয় কর্মচারীদের সম্মুখে অত্যাচারের অভিযোগ করছিল। কিন্তু তার প্রতিকারের কোন উপায় আমাদের হাতে ছিল না।

প্রশ্নের এই দিকটা আর আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে চাই না—কারণ আমার মনে হয়, ব্যবস্থা-পরিষদের এবারের অধিবেশনে মেদিনীপুর অন্যতম আলোচ্য বিষয় হবে। আমি এই কথা বলে শেষ করছি যে, এক মাস পূর্বেও আমাদের কাছে গ্রাম-আক্রমণের সংবাদ এসেছে। যারা আইন ও শৃঙ্খলার অভিভাবক, তারাই নিয়মিতভাবে নিঃসহায়া নারীদের শ্লীলতা-হানি করেছে—তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে। যারা অত্যাচারিত হয়েছে, তাদের বিবৃতি আমার সঙ্গে আছে। সে সব বিবৃতি যে কোন দেশের গবর্নমেন্টের পক্ষে কলঙ্কজনক। পুলিশ এদের বিবৃতি নেয় না ; গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার স্তম্ভদের দ্বারা অনুষ্ঠিত পাশবিকতার কবল থেকে এদের রক্ষা করার কেউ নেই। আমি ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রধান-

মন্ত্রীকে এ বিষয়ে লিখেছিলাম। অভিযোগগুলো সম্বন্ধে যদি কোন তদন্ত হয়ে থাকে, তাঁর কাছ থেকে তার ফলাফল জানার জন্য আমি অপেক্ষা করছি। গতকাল পূর্ববঙ্গের মুসলমান মেয়েদের ভাগ্যে এ দুর্ভোগ ঘটেছিল ; আজকে মেদিনীপুরের হিন্দু মেয়েরা ঠিক এই একই দুর্ভোগ ভুগছে। একজন শ্বেতাঙ্গিনী নারীকে যদি গবর্নমেণ্টের লোকের নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার খোরাক জোগাতে হত, তবে তার ফল কি হত? সংবাদপত্রের মুখবন্ধ। জনমতকে টুঁটি চেপে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা-পরিষদ এখনও ভারতরক্ষা-আইনের আওতার বাইরে। এই সব ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের একবাক্যে স্বাধীন তদন্তের দাবি জানানো উচিত। প্রকৃতপক্ষে মেদিনীপুর সম্বন্ধে সমস্ত সত্য আমাদের জানতে দেওয়া হোক—অপরাধীদের নিজেদের কিংবা তাদের সমর্থকদের দিয়ে সযত্নে তৈরি করা রিপোর্টের মারফৎ নয়—একটি নিরপেক্ষ স্বাধীন ট্রাইব্যু-নালের মারফৎ। জনগণের মধ্যে যারা রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবে কিংবা সাক্ষ্য দেবে, এই ট্রাইব্যুনাল তাদের রক্ষাব্যবস্থা করবেন।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের যে চিত্র আমি এঁকেছি তা উদাহরণমূলক মাত্র—চূড়ান্ত নয়। আমার অভিযোগগুলি অতিশয় গুরুতর ধরনের ; পূর্ণ দায়িত্ববোধ নিয়েই আমি অভি-যোগ করেছি। বর্তমান শাসনতন্ত্রে ব্যবস্থা-পরিষদের অবস্থা যা-ই হোক, তবু তাকে জনগণের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমুলক প্রতিষ্ঠান

বলতে হবে। যাঁদের কার্যকলাপ ও নীতির সমালোচনা আমি করেছি, তাঁরা এই ব্যবস্থা-পরিষদের সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়ান। তাঁরা কি সে সাহস পাবেন? পরিষদ-সদস্যদের কোন একটি সম্মেলনের সামনে এসে তাঁরা যা করেছেন তার কি কারণ নির্দেশ করবেন? পর্দার আড়ালে মতলব হাসিল করে অতঃপর ব্যবস্থা-পরিষদে তাঁদের রক্ষার জন্য মন্ত্রীদের নিয়োজিত করবার পরম সুযোগ তাঁদের রয়েছে। মন্ত্রীরা কি বলবেন, কি করবেন—আমি জানি না। আমার হৃদয়ের সমস্ত ব্যগ্রতা দিয়ে আমি মন্ত্রীদের অনুরোধ করছি, জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক শাসন উপযুক্ত ভাবে পরিচালনায় তাঁরা কি ভাবে বাধা পাচ্ছেন, তা তাঁরা খুলে বলুন। দেশের প্রতি তাঁদের আনুগত্য এই দাবি জানায়।

ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য রূপে আমরা শাসনতান্ত্রিক সংগ্রামের পথে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছুতে চাই। বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত যে সব দেশকে একদা অনিচ্ছুক হাত থেকে জোর করে নিজেদের স্বাধীনতার সনদ ছিনিয়ে নিতে হয়েছিল, তাদের ইতিহাসে শাসনতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং বিজয়ের গৌরবময় উদাহরণ আছে। ক্যানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাস পড়লে দেখা যাবে, এই সব উপনিবেশে আইনগত ক্ষমতা এবং শাসনতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে কি বিপুল ব্যবধান ছিল; ব্যবস্থা-পরিষদের দাবিতে কি ভাবে বহু গবর্নরকে স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কত্ব-মূলক অন্যায় কাজের জন্য

ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের জনগণও রাজার প্রতি আনুগত্যের চেয়ে নিজেদের অধিকার ও স্বাধীনতার বেশি মুল্য দেয়। জনগণের বিরুদ্ধবাদী একজন রাজাকে সেইজন্য চিরবিশ্রাম গ্রহণ করতে হয়েছিল। শাসনতান্ত্রিক অধিকারের জন্য আমাদের সংগ্রামের পথনির্দেশ ১৯৩৫-এর ভারত-শাসনতন্ত্র থেকে পাওয়া যাবে না। ভারতের আইন-সভাগুলোকেই নূতন রীতি ও আদর্শ সৃষ্টি করতে হবে। কুকার্যের অনুষ্ঠাতারা সাময়িকভাবে গবর্ণমেণ্ট-হাউস এবং সেক্রেটারিয়েটের রক্ষণশীল পরিবেষ্টনীতে নিজেদের নিরাপদ মনে করছে, কিন্তু এই স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান দাবি করতেই হবে। বাস্তবিক পক্ষে আমরা কি চাই ? ইংল্যাণ্ড যে ভাবে নিজেকে হিটলারের কলুষিত হাত থেকে রক্ষা করতে উদ্বিগ্ন, আমাদেরও ঠিক সেইভাবে বৃটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটানোর অধিকার আছে। আমরা যদি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ঐতিহাসিক উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলি যে একটা জাতির পক্ষে নতজানু হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মরা বহুগুণে ভাল, তবে কি আমরা দেশদ্রোহিতার দায়ে দোষী হব, আমাদের কি পঞ্চমবাহিনী নাম দেওয়া হবে ? জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী এই প্রদেশের সার্থক শাসন-নীতি গড়ে তুলবার স্বাধীনতা আমরা দাবি করি। আমরা চাই, জনগণের ইচ্ছার সবল অভিব্যক্তি পাবে পরিষদ-সদস্যদের কণ্ঠে ; সদস্যরা ফলাফলের কথা না ভেবে

জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পথে শাসকদের চলতে বাধ্য করবেন। তা করতে গিয়ে শৃঙ্খলাভঙ্গকারী বিঘ্নকর যে সব উচ্চপদাধিকারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে, পরিষদ নির্ভীক ভাবে তাদের পদচ্যুতির দাবি করবে।

আমরা দেখেছি, আমাদের প্রতিবেশী দেশ ব্রহ্মে বিপদের সময় কি ভাবে কত সহজে উচ্চ রাজকর্মচারীরা তাঁদের বিশেষ দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়েছিলেন; ব্রহ্মের মহান্ রক্ষকরা ভাগ্যের হাতে ও জাপানির কবলে ব্রহ্মবাসীদের ছেড়ে দিয়ে কেমন করে পালিয়ে এসেছিলেন! আজ আমরা একটা সর্তের পরিপূরণ চাই-ই—সেটা হচ্ছে, দেশের জনগণের প্রতি অবিচলিত আনুগত্য। কোন রাজকর্মচারী, তিনি যত বড়ই হোন, যদি এটা করতে না পারেন—তবে জঘন্যতম কুইসলিং বলে তিনি বিবেচিত হবেন; এ প্রদেশে তাঁর স্থান হবে না। পরিষদের সকল দলের সদস্যের কাছে আমি আবেদন করছি, অত্যাচার ও নির্যাতন সমূলে উৎপাটনের জন্য সংগ্রামে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দীর্ঘকাল আমরা পরস্পর বিবাদ করে নিজেদের দুর্বল করেছি; তার ফলে শক্তিশালী হয়েছে সেই সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, যাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে আমাদের ভেদ-বৈষম্যের উপর। আজ হিন্দু কিংবা মুসলমান হিসাবে নয়, বাঙালি ও ভারতীয় হিসাবে সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে আসুন আমরা এমন শাসন-প্রবর্তনের দাবি জানাই—যে শাসন আমাদের ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক ও

রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করবে। হিন্দু এবং মুসলমানের বহু বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু উভয়েই আমরা সমানভাবে দাসত্বকে ঘৃণা করি। অসহনীয় দাসত্বের অবসানের জন্যই আমি আপনাদের সমর্থন এবং সহযোগিতা প্রার্থনা করছি।

ক্রিপ্‌স-প্রস্তাবের অন্তঃশূন্যতা

হাউস-অব-কমন্সে ক্রিপ্‌স-প্রস্তাবের ব্যর্থতা-সম্পর্কীয় বিতর্ক থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ভারতীয়দের বিচার-পদ্ধতি ঠিক ভাবে বোঝা হয় নি। যারা পুরোপুরি ঘটনা জানে না তারা ভাবতে পারে, ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি বৃটিশ গবর্নমেণ্টের দেওয়া স্বাধীনতার সর্বসুযোগ-সমন্বিত মহামূল্য একটি প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। নিখিল-ভারত হিন্দু-মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটিই সর্বপ্রথম ক্রিপ্‌স-পরিকল্পনা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। পরিকল্পনার মধ্যে কল্যাণকর ও অকল্যাণকর উভয় দিকই তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, পরিকল্পনাটির প্রধান প্রধান অঙ্গ যেমন আছে অবিকল সেইভাবে গ্রহণ করতে হবে, অথবা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হবে। আমাদের

পক্ষে তাই ঐ পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোন প্রাদেশিক এককের বিচ্যুত হবার যে অধিকার, তাই নিয়ে আমি সর্বপ্রথমে আলোচনা করছি। বস্তুত, মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিতে বৃটিশ-গবর্নমেণ্ট আত্মসমর্পণ করেছেন। প্রস্তাবটির মধ্যে ভারত-ব্যবচ্ছেদের বীজ আছে—ভারতীয় জনগণের একটি মাত্র অংশের ইচ্ছাতেই তা অঙ্কুরিত হবে। তারা খোলাখুলি ভারতের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করে। তাদের আনুগত্য পৃথক একটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি—যার সঙ্গে কেবল বিশেষ একটি ধর্মমতের জনগণ-শাসিত অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যের মিত্রতা স্থাপিত হতে পারে। ভারতে বিভিন্ন ধর্ম জাতি ও সম্প্রদায়ের কোটি কোটি লোকের বাস হলেও স্মরণাতীত প্রাচীন কাল থেকে এই দেশ এক এবং অবিভাজ্য। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধদের বহু শতাব্দীব্যাপী প্রচেষ্টার ফলে এবং গত দুই শতাব্দী ধরে বৃটিশদের প্রচেষ্টায় ভারতে এই মূলগত ঐক্য গড়ে উঠেছে। ভারত-শাসনে বৃটেনের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব রাজনৈতিক ঐক্য-বৃদ্ধি। আর ১৯৪২ অব্দে বৃটিশ রাজনীতি-করা সেই ঐক্য নিজ হাতে ভেঙে দিতে চাচ্ছেন। অধুনা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন প্রাদেশিক একককে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের (স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স যাকে বলেছেন—নূতন ভারতীয় ইউনিয়ন) মধ্যে টেনে আনা সমস্যা নয়; সমস্যা

হচ্ছে—কি ভাবে ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, গভীরতর করা যায় এবং কি ভাবে কেন্দ্রের কঠিন নিয়ন্ত্রণকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে শিথিল করে স্বশাসিত প্রাদেশিক এককগুলিকে আরও ক্ষমতাপন্ন করে তোলা যায়। ভারতকে কয়েকটি স্বাধীন অংশে বিভক্ত করা হবে অথবা দুই বা ততোধিক স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করা হবে, তাদের প্রত্যেকেরই পৃথক সেনাবাহিনী রেলপথ ও মুদ্রানীতি থাকবে, যে-কোন স্বাধীন দেশের সঙ্গে আপোষ করার ক্ষমতা থাকবে, অথচ কেন্দ্রে কোন শক্তিশালী সুসংবদ্ধ গবর্নমেণ্ট থাকবে না—এরূপ কোন আয়োজনের অর্থ ভারতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার অপমৃত্যু ঘটানো।

আজ যে সভ্যতা-ধ্বংসী ভয়াবহ যুদ্ধ চলেছে, তার অন্যতম কারণ রূপে বিজড়িত রয়েছে কেন্দ্রীয় ইউরোপের বিভক্তিকরণ। চোখের উপর এই করুণ দৃষ্টান্ত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এমন একটি প্রস্তাবকে যে মুহূর্তের জন্যও বিবেচনা করা হচ্ছে—এটা বিসদৃশ লাগে। এ প্রস্তাব গৃহীত হলে ভারত পুরোদস্তুর দাবার ছকে পরিণত হবে। শুধু যে প্রদেশগুলিই (প্রধানত ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত) পরস্পর যুদ্ধ করে মরবে তা নয়, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিদেশি জাতিরাও ষড়যন্ত্র ও বিভেদ-সৃষ্টির অবকাশ পাবে। ভারতবর্ষ তার বহুবিচিত্র ইতিহাসে অনেকবার এরূপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছে। বৃটিশ-গবর্নমেণ্ট বিদায় নেবার প্রাক্কালে কেন এমন পরিকল্পনা

খাড়া করে যাচ্ছেন, যা ভারতের বিভিন্ন উপাদানকে একীভূত না করে, দেশকে বরঞ্চ অধিকতর বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঠেলে দেবে ?

প্রশ্ন হতে পারে, এরূপ বিপজ্জনক প্রস্তাব উত্থাপনের মূল কারণ কি ? উত্তর পাওয়া যায়, এ ছাড়া মুসলমান জনমত নাকি কোনরূপে সন্তুষ্ট হবে না। আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, যে ব্রিটিশ-গভর্নমেণ্ট গত পয়ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল ধরে ভারতের স্বায়ত্তশাসন দাবির ক্রমাগত বিরোধিতা করে আসছেন, সেই গবর্নমেণ্ট তিন বৎসরের বেশি বয়স নয় এমন একটি উদ্ভট দাবির সামনে আজ অবাধে আত্মসমর্পণ করছেন। একটি সম্প্রদায়ের অংশবিশেষ মাত্র ভারত-ব্যবচ্ছেদের দাবি জানাচ্ছে ; মুসলমানদের মধ্যেই এমন এক দল আছেন, যাঁরা এ প্রস্তাবের অনুকূলে নন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, বৃটিশ-নেতাদের কাছ থেকে তাঁরা কোনই উৎসাহ পান না। ভেদপন্থী দলই শুধু তাদের প্যান-ইসলামিক ধর্মোন্মাদনা চতুর্দিকে ছড়াবার উৎসাহ পেয়ে আসছে। এই সমর্থন আজ পরিণতি লাভ করেছে বৃটিশ-গবর্নমেণ্টের খোলাখুলি আশীর্বাদে। ভারতীয়-দের আভ্যন্তরীণ অশান্তি বজায় থাকুক, তারা নিরবচ্ছিন্ন তিক্ততা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে কাল কাটাক—এই যদি বৃটিশের কাম্য হয়, তবে এর চেয়ে উৎকট পরিকল্পনা তারা কখনও খুঁজে পাবে না।

আমাদের অনেক বন্ধু সমস্যাটার অনুধাবন না করেই

বলেন—ঠিকই তো, নয় কোটি মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে না ? এ প্রশ্নের আমি জবাব দিচ্ছি। বিচ্ছিন্ন হবার যে অধিকার দেওয়ার কথা হচ্ছে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ অঞ্চলের অধিবাসী হিসাবে মুসলমানদের দেওয়া হবে না—দেওয়া হবে এক একটি প্রাদেশিক একককে। বর্তমানে যে প্রাদেশিক সীমারেখা আছে, ভাষা সংস্কৃতি অথবা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে তা স্থিরীকৃত হয় নি ; তবু বিচ্ছিন্ন হবার সময় এই প্রাদেশিক সীমানা ধরেই বিচার চলবে। এ রকম প্রত্যেকটি প্রদেশেই হিন্দু মুসলমান খৃস্টান বৌদ্ধ জৈন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় আছে। বাংলার কথাই ধরা যাক। এখানকার লোক-সংখ্যা ছয় কোটি। তার মধ্যে শতকরা বাহান্ন জন মুসলমান, চুয়াল্লিশ জন হিন্দু। শতকরা বাহান্ন জন মুসলমান শতকরা চুয়াল্লিশ জন হিন্দুর ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে, বাংলাকে তারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে—এ কি রকমের আত্মনিয়ন্ত্রণের বিধি ?

বৃটিশ মুখপাত্ররা আত্মনিয়ন্ত্রণ-বিধির কথা বলে থাকেন ; শুধু প্রাদেশিক এককের মধ্যে এই বিধি সীমাবদ্ধ রাখবার কি অধিকার তাঁদের আছে—বিশেষ করে যখন দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক প্রাদেশিক এককের মধ্যেই বিভিন্ন ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে ? স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, সংখ্যাগুরু-সম্প্রদায় সেখানে "অত্যাচারী" হতে পারবে না, সে অঞ্চলের

সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়গুলির ভার স্বচ্ছন্দেই তাদের উপর দিয়ে বিশ্বাস করা চলবে। এরকম ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা রক্ষার যে দায়িত্ব বৃটিশ গবর্নমেণ্টের আছে তা কোন-ক্রমে ব্যাহত হচ্ছে না। প্রশ্ন জাগে, সামগ্রিক হিসাবে ভারতের ক্ষেত্রে এই একই আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রযোজ্য হবে না কেন? নিজেদের দেশকে ভারতীয়রা বিভক্ত করতে চায় কি না—এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার অধিকার ভারতীয় জনগণের কেন থাকবে না?

মুসলমানরা নিজেদের জন্য কি চায়, তা নির্ধারণ করার অধিকার তাদের দেওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের যে-সব লোক এই অঞ্চলে বাস করে তাদের অধিকার কেড়ে না নিয়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তা ছাড়া, ভারত-ব্যবচ্ছেদে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানও হতে পারে না। ব্যবচ্ছেদের পরও হিন্দু এবং মুসলমান একই অঞ্চলে বাস করবে। জাতীয়তার কোন সাধারণ আদর্শে উভয় দলের অনুপ্রাণিত হবার সম্ভাবনা তখন থাকবে না; বর্তমান ব্যবধান আরও ভয়াবহ রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। তখন বিভক্ত অঞ্চলগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বসম্প্রদায়ের রাষ্ট্রের প্রতি খোলাখুলি আনুগত্য জ্ঞাপন করবে। এই রকম যুক্তি প্রায়ই শোনা যায়, মুসলমানপ্রধান প্রদেশে হিন্দু অধিবাসীর প্রতি দুর্ব্যবহার হবে না, যেহেতু হিন্দুপ্রধান প্রদেশে তা হলে মুসলমানের প্রতি পাল্টা দুর্ব্যবহারের সম্ভাবনা ঘটবে। জিজ্ঞাসা করি, ভারতের

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই কি সুস্থ মনোবৃত্তি? ধর্মকে রাজনীতির বাইরে রেখে সাধারণ জাতীয়তার আদর্শে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্ভব হবে না—প্রতিশোধাত্মক মনোবৃত্তি প্রতিনিয়ত জাগিয়ে রেখে (এবং এরই স্বাভাবিক পরিণতি, দু'টি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধের দরজা খুলে রেখে) সম্প্রীতি বজায় রাখা হবে। কোন এক অঞ্চলে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোককে জামিন স্বরূপ মনে করা হবে—এ প্রস্তাব মর্মান্তিক ও ভয়াবহ। ভারতীয় জনকল্যাণে আগ্রহান্বিত কোন বৃটিশ বা ভারতীয়েরই এরূপ প্রস্তাবে সমর্থন করা উচিত নয়।

যে কোন দিক দিয়ে বিচার করা যাক—শেষ পর্যন্ত এই উত্তরই মিলবে, ভারত-ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব সামগ্রিকভাবে ভারতের নিরাপত্তা ও হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই কল্যাণের পরিপন্থী। ভারতীয় বা বিদেশি যারাই এই পরিকল্পনা সমর্থন করে, তারা ভারতের অগ্রগতির শত্রু। আমাদের কাছে এটা হচ্ছে জীবন-মরণের প্রশ্ন। এ সম্পর্কে কোনই আপোষ চলতে পারে না, ফলাফল বিচার না করে শেষ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতের সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়ের সমস্যার প্রকৃত সমাধান তা হলে কি ভাবে হওয়া উচিত? আমরা যখন বৃটিশের সঙ্গে আপোষ-আলোচনা চালাই, তখন স্বভাবতই আমরা এমন সমাধানের কথা ভাবি যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্ভব হবে, এবং যথাসময়ে বৃটিশ পার্লামেণ্টে আইনরূপে পরি-

গৃহীত হবে। এখানে আমরা প্রকাশ্য বৃটিশ-বিরোধিতা করে দেশের স্বাধীনতা-লাভের বিষয়ে আলোচনা করছি না, কিংবা গৃহযুদ্ধের দ্বারা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের কথাও চিন্তা করছি না। ক্রিপ্‌স-প্রস্তাবে ধরে নেওয়া হয়েছে, ভারতের পক্ষে এবং ভারতের সকল দলের পক্ষে সম্মানজনক একটা আপোষ-চুক্তি হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব ; বৃটিশ-গবর্নমেণ্ট সেই চুক্তি স্বীকার করে নেবেন। এই পরিকল্পনার মধ্যে সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়গুলির অধিকার-সম্বলিত গণপরিষদ ও বৃটিশ-শক্তির মধ্যে সন্ধির ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থা সকল দল স্বীকার করেছে। এর ফলে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়গুলির নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের উপযুক্ত রক্ষাকবচ থাকবে। আমি ধরে নিচ্ছি, শাসনতন্ত্র-ঘটিত আইনের মধ্যেই সন্ধির সর্তগুলি থাকবে, ভাবী ভারতের যুক্তরাষ্ট্র ও প্রাদেশিক একক-গুলির উপর ঐগুলি আবশ্যিকভাবে আরোপিত হবে। ভবিষ্যতে সন্ধি-সর্তের বিরোধী কোন অবস্থার যদি উদ্ভব হয়, তখন নিঃসন্দেহে শাসনতন্ত্র অনুসারেই তার প্রতিকারের পথ থাকবে।

এবার পরবর্তী অধ্যায়ে যাওয়া যাক। গণপরিষদের অধিবেশন হয়ে ভারতের জন্য শাসনতন্ত্র রচিত হবে। আপত্তি ওঠে, গণপরিষদে হিন্দুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে—তারা এমন একটি শাসনতন্ত্র গঠন করতে পারে, যা হয়তো ভারতের জাতীয় জীবনের একটি বড় অংশের বিরোধী বলে প্রতিপন্ন হবে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য আগে থেকেই সন্ধি বর্তমান আছে; শাসনতন্ত্রের খসড়া ঐ সন্ধিরই সর্তানুসারী হবে। কাজেই সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়ের অধিকার-বিরোধী কোন গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। তবু তর্কের খাতিরে প্রশ্ন করা যাচ্ছে, শাসনতন্ত্রের খসড়া-রচনায় কোন কোন সংখ্যালঘু-সম্প্রদায় যদি বিরোধিতা করে, তবে এই প্রকার অনৈক্যের অবসান ঘটানো যাবে কি ভাবে? এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, ভারতের মূলগত ঐক্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলার অধিকার দল বা সম্প্রদায়ের থাকবে না। কাজেই এ নিয়ে গণপরিষদ এবং সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিতর্কই উঠতে পারে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়বিশেষ কোন বিষয় নিয়ে শাসনতান্ত্রিক খসড়ার অংশ-বিশেষে আপত্তি তুলতে পারে—যেমন ধরুন, যুক্ত এবং ভিন্ন নির্বাচন-ব্যবস্থার প্রশ্ন, কিংবা ব্যবস্থা-পরিষদে ও চাকুরিতে আসন-সংরক্ষণের প্রশ্ন কিংবা শিক্ষাবিষয়ক সুযোগ-সুবিধার প্রশ্ন কিংবা ধর্মবিষয়ক অধিকারের প্রশ্ন ইত্যাদি। এসব সম্পর্কে গণপরিষদের সিদ্ধান্ত পরিগৃহীত হবে; কোন সংখ্যালঘু-সম্প্রদায় সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে, সুস্পষ্টভাবে তার কারণ দেখাতে হবে; মতভেদের বিষয়গুলো তখন একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যালের কাছে উপস্থাপিত করা হবে। বিরোধী-দলের সঙ্গে পরামর্শ করে গণপরিষদ এই আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যাল গঠন করবেন; সে ট্রাইবুন্যালে বিরোধী-দলের মনোনীত

সদস্যও থাকবেন। ট্রাইবুন্যাল যে সিদ্ধান্ত করবেন, তা গণপরিষদ এবং বিরুদ্ধবাদী দল উভয়ের সম্বন্ধেই বাধ্যতা-মূলক হবে, এবং তদনুযায়ী শাসনতান্ত্রিক খসড়ায় পরিবর্তন সাধিত হবে। বৃটিশ গবর্নমেণ্ট এই ভাবে গণপরিষদের কাছ থেকে যে শাসনতন্ত্রের খসড়া পাবেন, তা হয় পুরোপুরি মতৈক্যের ভিত্তিতে রচিত নয়তো আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যালের দ্বারা পরিগৃহীত।

নিজেদের সদিচ্ছা সম্বন্ধে মুসলমান ও বৃটিশ গবর্নমেণ্টের কাছে হিন্দুদের অথবা সামগ্রিকভাবে ভারতবাসীদের পক্ষ থেকে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি দেওয়া সম্ভব? জাতি-সঙ্ঘের বিধি অনুযায়ী সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়ের প্রতি যে আচরণ করা হয়, আমরা ঠিক সেইরূপ আচরণ করতেই প্রস্তুত। একটি বিষয়ে কেবল আমরা সম্পূর্ণ আপোষ-বিরোধী—ভারতকে কিছুতেই খণ্ড-বিখণ্ড হতে দেব না। শান্তি-রক্ষার খাতিরে যে বৃটিশ ভদ্রলোকেরা আমাদের এপ্রস্তাব গ্রহণ করতে বলেন—তাঁরা মনে রাখবেন, জীবনের ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি বিষয় আছে যেখানে আপোষ অসম্ভব। বৃটেন নিজে কেন হিটলারের সঙ্গে আপোষ করতে চাইল না? হিটলার ইউরোপের অধিবাসী, এবং খৃস্টানও। বৃটিশের আত্মসমর্পণ হিটলারকে নিশ্চয় খুশি করতে পারত। শান্তিরক্ষা ও আপোষের খাতিরে যুদ্ধরত বৃটেন তা করতে গেল না কেন? আপোষ না করে বৃটেন ও মিত্রশক্তি একটা মহৎ আদর্শ

নিয়ে যুদ্ধ করল, যার জন্য কোন প্রকার স্বার্থত্যাগই অবিধেয় নয়। আমাদের অবস্থাও ঠিক এই রকম। আমরা একান্তভাবে অনুভব করি, জনগণের একাংশ সামগ্রিকভাবে ভারতের শান্তি ও অগ্রগতি সম্বন্ধে উদাসীন; তাদের তুষ্টি-বিধানের জন্য আমরা মাতৃভূমির ঐক্য ও সংহতি কিছুতে বিনষ্ট হতে দিতে পারি না।

অনেক লোক আছেন, প্রকৃতই তাঁরা আমাদের মনোভাব বুঝতে পারেন না। আমি সেইজন্য বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার নিয়ে এত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলাম। আমি একান্তভাবে আশা করি, ক্রিপ্‌স-প্রস্তাবের এই অংশ কত ভয়াবহ তা উপলব্ধি করে উদার-হৃদয় সমস্ত সমালোচক প্রাণপণ চেষ্টা করবেন যাতে বৃটিশ-গবর্নমেণ্ট এই ব্যাপার থেকে তাঁদের সম্মতি প্রত্যাহার করেন।

অন্তর্বর্তী কালের জন্য যে ব্যবস্থা হচ্ছে, তা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। অন্তর্বর্তী কালে ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিদের হাতেই ক্ষমতা দিতে হবে। বর্তমান অবস্থায় ১৯৩৫-এর ভারত-শাসন আইন সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। যুদ্ধ জয় করতে হলে জনগণকে অনুভব করতে হবে, এ দেশ তাদের—গবর্নমেণ্ট তাদেরই; তাদেরই গবর্নমেণ্ট স্বাধীনতার যুদ্ধ করছে। প্রস্তাবিত জাতীয় গবর্নমেণ্ট (কেন্দ্রীয়) অন্তর্বর্তী কালে দেশ-শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা পাবে—স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স এই ধরনের সুস্পষ্ট ভরসা দিতে পারেন নি। বর্তমানে বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসন-পরিষদ্ কার্যরত আছে।

কিন্তু এই শাসন-পরিষদের সামগ্রিক দায়িত্ব নেই ; বড়লাটের সঙ্গে মতৈক্য না হলে ভারত-গবর্নমেণ্টের নীতি-নির্ধারণে ভারতীয় সদস্যদের কোন হাত নেই। অন্তর্বর্তী কালের জন্য বড়লাট সম্রাটের কাছে দায়ী থাকলেও দেশরক্ষা এবং জনকল্যাণ-ঘটিত সকল প্রশ্নে তিনি মন্ত্রিমণ্ডলের উপদেশ অনুসারে চলবেন, অবিলম্বে এই ব্যবস্থা চালু করতে কি বাধা আছে ? বড়লাটের শাসন-পরিষদের কেবলমাত্র ভারতীয়করণ আমরা চাই না। যেমন ভারতীয়করণ চাই—তেমনি ক্ষমতাও চাই। বলা হয়েছে, সংখ্যালঘিষ্ঠ-সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ-সম্প্রদায়ের অত্যাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে বলেই ঐ ধরনের মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা সম্ভব হয় নি। এটা একটা অপকৌশল ছাড়া কিছু নয়। যে কোন দেশে জাতীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করলেই সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য হবে। দেখতে হবে, মন্ত্রিমণ্ডলে সংখ্যালঘিষ্ঠ স্বার্থের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব আছে কিনা। শাসনতন্ত্র এমনভাবে রচিত ও কার্যে পরিণত হয়েছে কিনা যাতে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ সম্পর্কে কোন সম্প্রদায়েরই অভিযোগের কারণ না থাকে।

ভারতীয়রা দেশরক্ষা-নীতি নির্ধারণ ও কার্যে পরিণত করার ক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি চাইবে—এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ভারতীয়রা দাবি করে, বিদেশি আক্রমণ থেকে দেশরক্ষার জন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র দিতে হবে, তাদের সামরিক শিক্ষা দিতে হবে। তারা চায়, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে,

ভারতের শাসনকার্য সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করবে ভারতীয়রা। বিদেশির নিয়ন্ত্রণ অথবা বৈদেশিক আক্রমণ কোনটাই তারা পছন্দ করে না। তারা প্রভু-পরিবর্তন চায় না। বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মনোভাব যে রকমই থাকুক, যদি বিশ্বাস করে তাদের উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়, তারা যে শুধু জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে তাই নয়—সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সমর্থক অজেয় মহাশক্তিরূপে প্রতিভাত হবে।

বলা হয়ে থাকে, ভারতীয়রা নাকি দেশরক্ষার নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের পক্ষে উপযুক্ত নয়। কিন্তু আমাদের হাতে জাতীয় রক্ষা-ব্যবস্থার প্রকৃত ক্ষমতা না দেওয়া পর্যন্ত কি করে এমন মন্তব্য করা যেতে পারে? সিঙ্গাপুর মালয় ও ব্রহ্মে বৃটিশদের বিপর্যয়ের পরও একথা বলা অত্যন্ত বিপজ্জনক যে ভারতীয়দের হাতে সব ছেড়ে দিলে তারা অবস্থা শোচনীয় করে তুলবে। এ কথা সত্য, ভারত এককভাবে সমর-নীতি নির্ধারণ করতে পারবে না। মিত্রপক্ষীয় সমর-পরিষদ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমর-পরিষদ নীতি নির্ধারণ করছেন, তাঁদের মধ্যে ভারতের জাতীয় গবর্নমেণ্টের প্রতি-নিধিরও স্থান থাকবে। তবেই ভারতরক্ষার জন্য দেশের সমস্ত সম্ভাব্য শক্তি সংহত করার পূর্ণ ক্ষমতা গবর্নমেণ্টের করায়ত্ত হবে।

প্রচুর মধুবাক্য সত্ত্বেও পরস্পরের মন এখন গভীর

অবিশ্বাসে আচ্ছন্ন। এই সঙ্কট-মুহূর্তে বৃটেনের কর্তব্য অত্যন্ত সহজ ও সরল। ভারত সমস্ত শক্তি নিয়ে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে—এই যদি প্রকৃতই বৃটিশ চায়, তবে তাকে ভারত-ব্যবচ্ছেদের দুষ্ট সম্ভাবনা সম্বন্ধে আদৌ কোন উল্লেখ না করে যুদ্ধের শেষে ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে—এসম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা করতে হবে। এখন যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতবর্ষের স্বাধীন পদমর্যাদা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় গবর্নমেণ্ট এমনভাবে গঠিত হবে, যাতে মিত্রপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতায় যুদ্ধ করা সম্ভব হয়। এই গবর্নমেণ্ট-গঠনে সাহায্যের জন্যে অবিলম্বে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে আহ্বান করতে হবে। এই গবর্নমেণ্টের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করতে হবে; ভারতের প্রয়োজন অনুসারে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতা তাকে দিতে হবে। দু-চার জন বিরুদ্ধবাদী থাকলেও এ বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, এই ধরনের প্রস্তাব সাধারণভাবে জন-সমর্থন লাভ করবে। যারা দূরে সরে থাকবে তারা বিস্মৃতির অতলে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সামগ্রিক যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তর এবং পারস্পরিক বিশ্বাস সংস্থাপনের প্রয়োজন। এই বিলম্বিত ক্ষণেও বৃটেন কি সাড়া দেবে?

জাতীয় দেশরক্ষা

(২০শে জুন, ১৯৪০ তারিখে কলিকাতায় যুদ্ধ-পরিস্থিতি আলোচনার জন্য গবর্নরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা)

বিজয়-লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের সাহায্য-দানের আকাঙ্ক্ষা পুনর্জ্ঞাপন করে এইমাত্র আমরা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। সাফল্যজনকভাবে যুদ্ধ-পরিচালনার জন্য বাংলা দেশের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনবল ও সমর-সম্ভার সরবরাহের সামর্থ্য থাকা একান্তভাবে আবশ্যক। ইউরোপের সঙ্কট থেকে আমরা আমাদের ক্রম-বর্ধমান অসহায়তা বুঝতে পারছি। বাঙালিকে আধুনিক যুদ্ধ-প্রণালীর সমস্ত শাখায় সুশিক্ষিত করে তোলার ব্যাপক নীতি যতদিন কার্যে পরিণত করা না হচ্ছে, ততদিন আমরা অন্যকে যুদ্ধ-ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কি সাহায্য করতে পারি? বৃটিশ-গবর্নমেণ্টের সামরিক নীতির ফলে ভারতবাসীরা নিরস্ত্র ও আত্মরক্ষার উপায়-বিহীন হয়ে পড়েছে। এর ভয়াবহ ফল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা এখন আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি অতীতের কিছু কিছু উল্লেখ করছি, সরকারি নীতি অবিলম্বে পুনর্বিবেচিত হবে এই আশায়। বাঙালি ও অন্যান্য ভারতীয়ের উপর পূর্ণ আস্থা

স্থাপন করতে হবে ; তাদের সামরিক শিক্ষার পথে কোনরূপ বাধা দেওয়া উচিত নয়। কোন আইন যদি বাংলা বা অন্য প্রদেশের জাতীয় সেনাবাহিনী সংগঠনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, অবিলম্বে আমাদের দেশের দাবি ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে সেই আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করতে হবে। কর্তৃপক্ষের বর্তমান দোমনা নীতিতে ভারতীয়রা কখন সন্তুষ্ট হতে পারে না। আমরা দেশ-রক্ষার অধিকার দাবি করছি—পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে স্বাধীন দেশে স্বাধীন নাগরিকদের যে অধিকার আছে, আমরা নিজেদের সমর-সজ্জায় সজ্জিত করবার সেই অধিকার-ই চাই। শত্রুর সম্মুখে আজ দেশের পর দেশ লুটিয়ে পড়ছে, এ সময় যুদ্ধ-জয়ের জন্য সংকল্প ঘোষণা করে শুধুই একটা প্রস্তাব-গ্রহণ নিতান্ত অর্থহীন। সংবাদ প্রচার কিংবা সিভিক-গার্ড সংগঠনের সার্থকতা কোন কোন অবস্থায় থাকতে পারে, কিন্তু প্রধান প্রয়োজন—কথা এবং প্রস্তাবের নয়, কাজের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীদের অনুভব করতে দিতে হবে, মাতৃভূমি-রক্ষার জন্য সমর-সজ্জায় সজ্জিত হবার সকল সুবিধা তাদের দেওয়া হচ্ছে।

শুধু সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই ভারতবর্ষ এই সঙ্কট-ক্ষণে তার কর্তব্য করতে পারবে না। আধুনিক যুদ্ধ আক্রমণাত্মক হোক কিংবা আত্মরক্ষামূলকই হোক, তার প্রথম প্রয়োজন শক্তিশালী যন্ত্রশিল্প। এ ব্যাপারেও অবিলম্বে

সরকারি নীতির পরিবর্তন আবশ্যক। ভারতের চেয়ে কাঁচা মালের অধিকতর সম্পদ প্রায় কোন দেশেরই নেই, অথচ ভারত-কল্যাণের জন্য এপর্যন্ত এই কাঁচা মাল ব্যবহৃত হয় নি। ভারতকে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং যন্ত্রশিল্পে আত্ম-নির্ভরশীল করে তুলতে হবে—শুধু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যাপারে নয়, এরোপ্লেন, স্বয়ংচালিত এঞ্জিন, আবহাওয়া-বিজ্ঞান, যানবাহন, বৈদ্যুতিক শক্তি, তরল ইন্ধন ইত্যাদি সহ অতি-প্রয়োজনীয় রাসায়নিক ও গঠনবিদ্যা বিষয়েও। পুনর্গঠনের এই বিরাট কর্মে প্রয়োজন হলে আমরা বিদেশি বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসব বটে,—কিন্তু প্রধানত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও কর্মীরাই প্রচুর সংখ্যায় কাজে নিযুক্ত হবে। প্রাদেশিক সম্পদ-সম্ভারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সর্বত্র কাজ শুরু করতে হবে। এই কাজ অসম্ভব, কিংবা কাজ আরম্ভ করার পক্ষে অত্যন্ত দেরি হয়ে গেছে—এরকম কোন অজু-হাত আমরা শুনতে রাজি নই। গবর্নমেণ্ট যদি ঐকান্তিকতার সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় স্বার্থের জন্য সকল দলের মিলিত সহযোগিতায় অবিলম্বে কাজে হাত দেন, তবে কিছুই অসম্ভব হবে না। এই প্রসঙ্গে চীনের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। চীন জাপানের বিরুদ্ধে গত দুই বৎসরের কঠিন সংগ্রামের মধ্যেও বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে নিজের সামরিক শিল্প গড়ে তুলেছে। বহুবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও রাইফেল, বন্দুক, টোটা, এরোপ্লেনের অংশ, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি,

মোটর গাড়ি, লরী, টেলিফোনের অংশ, রেডিওর অংশ প্রভৃতি নির্মাণের জন্যে চীনের পশ্চিমাঞ্চলে অনেক বড় বড় কারখানা স্থাপিত হয়েছে। দেশরক্ষার ব্যাপারে ভারতের সহযোগিতা পাবার জন্য গবর্নমেণ্ট সত্যই যদি উদ্বিগ্ন হয়ে থাকেন, তবে অবিশ্বাস ও সন্দেহের আবহাওয়া সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে হবে, ভারতীয়দের বিশ্বাস করতে হবে। শুধু ভারতের জনবলকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সমর-শিক্ষায় শিক্ষিত করলেই চলবে না, তার বিজ্ঞান ও শিল্প-সম্ভাবনাকেও জাগিয়ে তুলতে হবে।

যে কাল অতিক্রম করে আমরা চলেছি, ইতিহাসে এর তুলনা নেই। 'শক্তিই অধিকার'—মানব-সভ্যতা ধ্বংস করার জন্য এই নীতি-প্রয়োগের চেষ্টা চলছে। অবিলম্বে এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হবে, যাতে ভারত মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারে—যুদ্ধের উদ্দেশ্য অন্য কোন যুধ্যমান জাতির চেয়ে তার কাছে কম পবিত্র ও প্রিয় নয়। ইংল্যাণ্ডে ভারত-সচিব সেদিন ম্যাগনা-কার্টার বিষয় স্মরণ করে অনেক ভাল ভাল কথা বলেছিলেন। ম্যাগনা-কার্টাকে ইংরেজরা জন্মস্বত্ব বলে দাবি করে ; এই ম্যাগনা-কার্টায় সই করার জন্যে ১২১৫ অব্দে তারা এক অনিচ্ছুক রাজাকে বাধ্য করেছিল। ১৯৪০ অব্দে ভারতকে স্বেচ্ছায় ম্যাগনা-কার্টা দিয়ে ইংল্যাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে কেন নতুন অধ্যায় রচনা করছে না ? ভারতকে কেন স্বাধীন দেশ বলে স্বীকার করছে না ? এই বিলম্বিত ক্ষণেও জাতীয় দেশ-রক্ষার কর্মপদ্ধতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীন

ভারতবর্ষ যদি ইংল্যাণ্ড ও তার মিত্রদের সঙ্গে হাত মেলায়, তবে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য একটি নবশক্তির অভ্যুদয় হবে। সঙ্কট-মুহূর্তে শক্তি ও মর্যাদার মরচে-ধরা নীতির কাঠামোয় রচিত দোমনা ঘোষণার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন, সাহসিক দৃঢ় রাজনীতির—যা লক্ষ লক্ষ ভারত-বাসীর হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। যার ফলে নিজ স্বার্থে এবং পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্য ভারতবাসী ও বৃটিশশক্তি সম্পূর্ণ সমভিত্তিতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করবে, একই সাধারণ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য যুদ্ধ করবে। সকল ব্যবধান মুছে ফেলে প্রকৃত ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করতে না পারলে বাংলা দেশে জাতীয় দেশরক্ষা-ঘটিত কোন আয়োজন সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না। বাংলার হিন্দুদের প্রতি ভীষণ অন্যায় করা হয়েছে; তার ফলে কর্তৃপক্ষের ন্যায়বুদ্ধি ও সাধুতা সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস রূঢ় ভাবে ভেঙে গেছে। যথাসময়ে তারা নিশ্চয়ই এর প্রতিকার দাবি করবে। সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে আপনার কাছ থেকে আমি একথাও গোপন করতে চাই না যে, যুদ্ধ-পরিস্থিতি পরিবর্তনের ফলে তাদের জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হতে পারে—এরূপ ভীতিও বাংলার হিন্দুদের একটা বিরাট অংশের মনে রয়েছে। আমি কামনা করি, আমাদের এই ভয় মিথ্যা প্রমাণিত হোক। আপনার কাছে ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করছি, যতদিন আপনি বাংলার গবর্নরের গুরুদায়িত্ব পালন করবেন, ততদিন দেখবেন

এই চরম দুর্দিনে যেন প্রত্যেক বিভাগেই শাসনকার্য এমন ন্যায় পন্থায় চলে, যাতে জাতি-নির্বিশেষে নর-নারী সকলেই পরম বিশ্বাসে পরস্পর হাত মেলাতে পারে, তারা জাতীয় দেশরক্ষার গঠন-নীতি অনুসরণ করতে পারে। এর ফলে দেশে সুখ ও সম্প্রীতি আসবে, নিখিল পৃথিবীতে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও নিরাপত্তা বিধানের মহৎ কর্মে বাংলা দেশ উপযুক্ত সহায়তা করতে পারবে।

সমাপ্ত